Contents

তাওহীদের ডাক

জুলাই-আগস্ট ২০১৪

গাযায় রক্তের প্রস্রবণ : মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ

- ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৬
- পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার
- ত্যাগের মহিমায় চিরভাস্বর ঈদুল আযহা : আমাদের করণীয়
- মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও হিন্দু শাস্ত্রে কল্কি অবতার : একটি পর্যালোচনা
- ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান (শেষ কিস্তি)
- ইসলাম ও কুসংস্কার

Contents

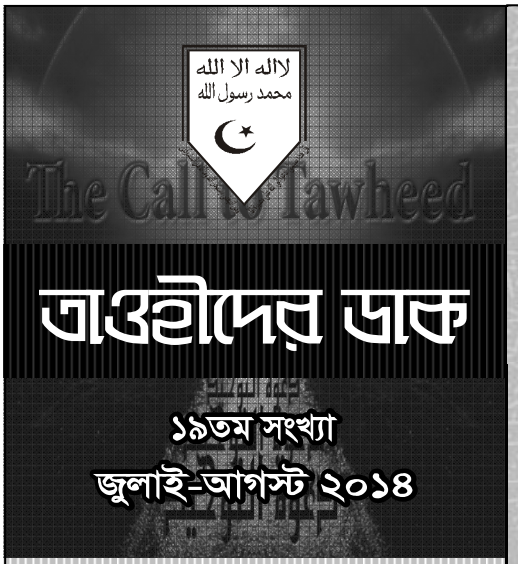

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

১৯তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০১৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
সহকারী সম্পাদক
বযলুর রহমান

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **আক্বীদা** ৫
  ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৬
  মুযাফফর বিন মুহসিন
- **তাবলীগ** ১৩
  ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান
  আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস
- **তারবিয়াত** ১৭
  পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার
  বযলুর রহমান
- **ধর্ম ও সমাজ** ২২
  ত্যাগের মহিমায় চির ভাস্বর ঈদুল আযহা : আমাদের করণীয়
  আব্দুল্লাহ
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ২৭
  গাযায় রক্তের প্রস্রবণ : মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ
  আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ৩৩
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে** ৩৫
  আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ
- **চিন্তাধারা** ৩৮
  মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও হিন্দু শাস্ত্রে কল্কি অবতার : একটি পর্যালোচনা
  আবু নাফিয মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী
- **শিক্ষা ও সংস্কৃতি** ৪৩
  ইসলাম ও কুসংস্কার
- নাফিসা বিনতে জালাল (জাদীদা)
  জীবনের বাঁকে বাঁকে ৪৮
  শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানীর সাথে সাক্ষাৎ
- **আলোকপাত** ৫০
- **সংগঠন সংবাদ** ৫২
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫৫
- **আইকিউ** ৫৬

সম্পাদকীয়

কর্মীরাই সংগঠনের শক্তিশালী কাঠামো :

দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে সংগঠন অন্যমত। দরস, লেখনী, বক্তব্য, মিডিয়া ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমেও বিভিন্ন দেশে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে সংগঠনের বিষয়টি একটু ব্যতিক্রম। কারণ সংগঠন উক্ত মাধ্যমগুলোকেও পরিচালনা করতে পারে। তাছাড়া পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে স্তরে স্তরে দক্ষ কর্মী বা দাঈ গঠন করে এবং সমাজের বিভিন্ন স্থানে আলোকস্তম্ভের মত স্থাপন করে ও দাওয়াতী কার্যক্রমকে বেগবান করে।

সংগঠনের আরবী প্রতিশব্দ 'জামা'আত'। যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ একদল মানুষকে জামা'আত বা সংগঠন বলে। ইসলামে জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করার জন্য যেমন বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনি দাওয়াতী কাজও ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(ইউসুফ ১০৮)*। তাই সাংগঠনিক জীবনে সহজেই উক্ত দু'টি নির্দেশ পালন করা যায়। উক্ত বাস্তবতার আলোকে বুঝা যায়, যে সংগঠনে দূরদর্শী কর্মীর সংখ্যা যত বেশী, তার কার্যক্রম তত গতিশীল; কাঠামো তত শক্তিশালী। যেমন- যে গাছের শাখা-প্রশাখা যত বেশী, সে গাছ তত বেশী ফল দেয়। তার শিকড়কে গভীরে প্রোথিত করে, ভারসাম্য রক্ষার জন্য নিজের গড়া শক্ত করে; অনেক বড় জায়গা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং অপররে জন্য শান্তির নীড় হিসাবে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখে।

সংগঠনের কর্মীদের গুণাবলী কেমন হতে হবে সে সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপ নেতৃবৃন্দের অবস্থান এবং ব্যক্তিগত আচরণ কেমন হবে তারও অসংখ্য নমুনা পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব আল্লাহ্র অনুগ্রহ এই যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত। আপনি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার সংসর্গ হতে দূরে সরে যেত। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। আর যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর তাঁর সাথে যারা আছেন, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি রহম দেল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখতে পাবেন। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাদের বর্ণনা এভাবেই দেয়া হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্য ক্ষেতের মত, যার চারা গাছগুলো অঙ্কুরিত হয়। পরে সেগুলো শক্ত ও পুষ্ট হয়ে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীকে আনন্দিত করে। এভাবে কাফেরদের মধ্যে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন' *(ফাতহ ২৯)*।

সংক্ষেপে হলেও উক্ত দু'টি আয়াতে কর্মী ও দায়িত্বশীলের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী চিত্রিত হয়েছে। অনুগত, আল্লাহভীরু, ত্যাগী ও কর্মঠ কর্মীর সমাগম দেখে দায়িত্বশীল চাষীর মত আনন্দ ও স্মৃতি উপভোগ করবেন। পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবেন। অন্যের মুখে কারো দোষ-ত্রুটির কথা শুনা মাত্রই যাচাই না করে প্রচার করার প্রতি উৎসাহিত হবেন না। তিনি যে পর্যায়ের ব্যক্তিই হন। এখানে ব্যক্তিগত বা সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে ঈমানের শর্ত রক্ষা করা যরূরী। বরং কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ যেন না থাকে সে জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন *(হাশর ১০)*।

পরামর্শের সময় যার প্রস্তাব কল্যাণকর মনে হবে তার প্রস্তাবকেই প্রাধান্য দিতে হবে। ঈর্ষান্বিত হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমতার আতিশয্যে স্বীয় যিদ বাস্তবায়ন করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। পরামর্শ ও মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর চেয়ে ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ প্রাধান্য পেয়েছিল এবং সে সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছিল *(বুখারী হা/৪০২)*। পরামর্শের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক। তাই বলে পরশ্রীকাতর হয়ে রাসূল (ছাঃ) তাকে কোণঠাসা বা পরিত্যাগ করার কৌশল অবলম্বন করেননি। অনুরূপ আবুবকর (রাঃ) সহ অন্য ছাহাবীগণও ওমর (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষের বিধ্বংসী মারণাস্ত্র প্রয়োগ করেননি। বরং তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মর্যাদার প্রতি কড়া দৃষ্টি রেখেছেন। কারণ এখানে তাক্বওয়া ছাড়া কোনকিছুরই প্রাধান্য নেই। আর এর সর্বোত্তম বিচারক হলেন মহান আল্লাহ। এ জন্য জোর করে, কৌশল অবলম্বন করে সম্মান ও মর্যাদা আদায় করা যায় না, পাওয়াও যায় না। এটা প্রদানের একমাত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন *(নিসা ১৩৯)*।

মূলকথা যেকোন পর্যায়ের দায়িত্বশীলের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ও প্রধান কৃতিত্ব হল, যোগ্য, সচেতন, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তি ও কর্মীকে অনুগত করে রাখা। অপরিণামদর্শী, অবচেতন, নিষ্ক্রীয় অবুঝকে বস করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। কারণ এটা যে কেউ পারে। এদের দ্বারা সাময়িকভাবে উদ্দেশ্য সাধন করা গেলেও সত্বর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তাই দায়িত্বশীলের অবস্থান অনুকরণীয় অনুসরণী। যাতে তিনি তার কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, আচার-আচরণ সবকিছুই যোগ্য কর্মীর জন্য হবে মডেল; হবে ঈর্ষণীয় আকর্ষণের বস্তু। এর বিপরীত হলে পরস্পরের মাঝে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও দূরত্ব সৃষ্টি হবে। এটা কোন কর্মীর মাঝে দেখা দিলে যে ক্ষতি সাধিত হয়, দায়িত্বশীলের মাঝে দেখা দিলে হাযার গুণ বেশী ক্ষতি হয়। কারণ এর প্রভাব পড়ে সমস্ত কর্মীর উপর। এ জন্য এখানে দায়িত্বশীলের ভূমিকাই বেশী। কারণ তাদের মর্যাদা যেমন বেশী, তেমনি কর্তব্যও বেশী। ক্বিয়ামতের মাঠে আরশের তলে ছায়াও পাবেন তারাই।

কর্মীদের মাঝে মনোমালিন্য দেখা দিলে সংগঠন যেমন ধাক্কা খায়, তেমনি কর্মীদের বিয়োগ ঘটতে থাকলে কাজের পরিধি সঙ্কুচিত হয়, ভিত্তি দুর্বল হয়, ধারাবাহিকতা বিপর্যস্ত হয়। এটা সবারই জানা। এর মূল কারণ পরস্পরের মধ্যে দ্বিমুখী চরিত্র ফুটে উঠা এবং ঈর্ষণীয় বিষয়গুলো যিদ ও হিংসার আগুনে রূপান্তরিত হওয়া, যেখানে আমিত্ব, অহংকার, আত্মপ্রশংসা, গীবত-তহমত, মিথ্যা-শঠতা, দমন-পীড়ন, মাইনাস-বিয়োগ ইত্যাদি চরিত্র সর্বদা চাটনির মত উৎসাহ যোগায়। তখনই ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, সন্দেহ ঘনীভূত হয়, হতাশা আচ্ছন্ন করে।

অতএব নির্ভেজাল দাওহীদের দাওয়াতকে সম্প্রসারিত করার মহান লক্ষ্যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের অদম্য স্বার্থে কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সম্পর্ক সীসা ঢালা প্রাচীরের মত স্থায়ী হওয়া অত্যাবশ্যক, যাতে সাংগঠনিক কাঠামো ইস্পাত কঠিক শক্ত হয়। এক্ষেত্রে আমাদের মূল প্রেরণা হলেন, নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের সুযোগ্য উত্তরসূরি। আল্লাহ আমাদেরকে শক্তিশালী, ভারসাম্যপূর্ণ, সুদৃঢ় ও স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের শ্রমকে কবুল করুন-আমীন!!

তওবা বা আল্লাহ্র নিকট বিনীত হওয়া

আল-কুরআনুল কারীম :

১- إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

(১) 'নিশ্চয় আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ইরাই তারা যাদের তওবা আমি কবুল করি আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৫৯-১৬০)*।

২- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

(২) 'রাসূল এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসার তার আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা তোমার নিকট আসলে ও আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে' *(নিসা ৪/৬৪)*।

৩- حم- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ- غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

(৩) 'হা-মীম। এআি কিতবা অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নিকট থেকে। যিনি পান ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। প্রত্যাবর্তন তারই নিকটে' *(মুমিন ৪০/১-৩)*।

٤- وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

(৪) 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন' *(শূরা ৪২/২৫)*।

٥- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(৫) 'পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও; ইহা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু সীমালংঘন করার পর তওবা কররে ও নিজেকে সংশোধন করলে অবশ্যই আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন; আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(মায়েদা ৫/৩৮-৩৯)*।

٦- قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ- وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

(৬) 'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হস্তে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবে, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশস্ত করবেন'। 'আর তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

٧- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ- فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ- فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ.

(৭) 'আর সেই দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে? সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছির এবং ঈমান আনিয়াছিল ও সৎকর্ম করেছিল আশা করা যায় সে সাফাল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(ক্বাছাছ ২৮/৬৫-৬৭)*।

٨- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...

(৮) 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর-বিশুদ্ধ তওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত...' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

٩- إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

(৯) 'যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে তিনি তো তওবা কবুলবারী' *(নাছর ১১০/১-৩)*।

١٠- قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ- وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

(১০) 'তোমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন। আর তিনি তাদের অন্তরের খবর দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/১৪-১৫)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১১– عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

(১১) আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, রাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ দয়ার হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনে অপরাধী তাঁর নিকট তওবা করে। এমনিভাবে দিনে তিনি তাঁর নিজ হাত প্রসারিত প্রশস্ত করেন, যাতে রাতের অপরাধী তাঁর নিকট তওবা করে। এমনিভাবে প্রত্যেকদিন চলতে থাকবে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম হা/৭১৬৫; মিশকাত হা/২৩২৯)*।

১২– عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ.

(১২) ইবনু ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন, প্রাণ কণ্ঠনালীতে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত *(তিরমিযী হা/৩৫৩৭; মিশকাত হা/২৩৪৩, সনদ ছহীহ)*।

১৩– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِى (ص) وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا.

(১৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) সূরা ছোয়াদে সেজদা করেন এবং বলেন, দাউদ (আঃ) এই সেজদা দিতেন তওবার জন্য এবং আমরা দিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য *(নাসাঈ হা/৯৫৭; মিশকাত হা/১০৩৮, সনদ ছহীহ)*।

১৪– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ.

(১৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হেলাল ইবনু উমাইয়া (রাঃ) তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অভিযোগ করল। সে সাক্ষী দিল এবং নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী। তবে কী তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে? অতঃপর স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে শাস্তি দিল*(বুখারী হা/৪৭৪৭; মিশকাত হা/৩৩০৭)*।

১৫– عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِى مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ لاَ. قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا.

(১৫) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি অনেক বড় গুনাহ করে ফেলেছি; আমার কী তওবা হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মা আছে কী? লোকটি বলল, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার খালা আছে কি? লোকটি বলল, আছে। তিনি তখন বললেন, তার সাথে সদ্ব্যবহার কর *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৩৫, সনদ ছহীহ)*।

১৬– عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفَّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِىُّ التَّوْبَةِ وَنَبِىُّ الرَّحْمَةِ .

(১৬) আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেকগুলো নাম ছিল। তিনি নিজে বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, আল-মুকাফ্ফী, আল-হাশর, নবীউত তওবা ও নবীউর রহমাহ' *(মুসলিম হা/৬২৫৪; মিশকাত হা/৫৭৭৭)*।

(১৭) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

(১৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্নিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর উত্তম ভুলকারী সেই, যে ভুল করার পর তওবাকারী *(তিরমিযী হা/২৪৯৯, সনদ হাসান)*।

(১৮) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ».

(১৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন *(মুসলিম হা/৭০৩৬; মিশকাত হা/২৩৩১)*।

(১৯) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ عَلَيْكُمْ ».

(১৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যদি তোমরা অন্যায় করে থাক; এমনকি তা যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় অতঃপর তোমরা তওবা কর তাহলে তোমাদের সে তওবা আল্লাহ কবুল করবেন *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯০৩)*।

(২০) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » ..

(২০) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)- কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় দিনে আমি আল্লাহ্র নিকট সত্তরবারেরও অধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা করি *(বুখারী হা/৬৩০৭; মিশকাত হা/২৩২৩)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, তওবাকারীদের সাথে বস, কেননা তাদের অন্তর নরম থাকে।

২. কালবী (রহঃ) বলেন, জিহ্বা দিয়ে ইস্তেগফার কর, অন্তর দিয়ে অনুশোচনা কর এবং শরীরকে অপবিত্র থেকে বিরত রাখ।

সারবস্তু

১. তওবা ঈমানের পূর্ণাঙ্গ রূপ এবং ইসলামের সৌন্দর্য্য।

২. তওবা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ভালবাসার কারণ। কেননা আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন।

৩. তওবাকারীর জন্য আল্লাহ্র রহমত সুপ্রশস্ত।

৪. সাধারণ ও ব্যক্তি বিশেষ সবার উপরই তওবা করা ও তার উদ্যোগ নেয়া ওয়াজিব।

৫. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও বদান্যতা তওবাকারীর দীপ্তি ছড়ায়।

ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৬

-মুযাফফর বিন মুহসিন

ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারকারী ফের্কা সমূহ :

(এক) ছূফীবাদ :

আরবী 'ছূফ' শব্দ থেকে ছূফী শব্দের জন্ম। ছূফ অর্থ পশম। ছূফীরা তাদের সন্ন্যাসের ভান ধরে পশমের কাপড় পরত বলেই ছূফী বলা হয়। ছূফী রোগাগ্রস্ত কতিপয় মূর্খ ব্যক্তি একে 'আহলে ছুফফা'-এর সাথে তুলনা করেছেন। এটা নিতান্তই অজ্ঞতা।[১] ইবনু খালদূনের মতে দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে এই মতবাদের জন্ম হয়।[২] মরমীবাদ বলেও এর পরিচিতি রয়েছে। খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক দর্শনের সাথে মিশ্রিত হয়ে মুসলিম সমাজে মা'রেফতের নামে উক্ত মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ইরাকের বছরা নগরীতে যুহ্দ বা দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা থেকে এটা প্রথম শুরু হয়।[৩] এই দর্শনের সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের তিনটি স্বর্ণযুগে এর অস্তিত্ব ছিল না। ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী (মৃঃ ২৬১ হিঃ) (বায়েযীদ বুস্তামী) এবং হুসাইন বিন মানছূর হাল্লাজ (মৃঃ ৩০৯ হিঃ) এই দর্শনের মূল প্রচারক ছিলেন। পরবর্তীতে ছূফী সম্রাট সিরিয়ার মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৬৩৮ হিঃ) এই আক্বীদার বিস্তৃতি ঘটান।

উক্ত থিওরিতে বিশ্বাসী লোকেরা আল্লাহভীতি অর্জন ও সার্বক্ষণিক যিকির-আযকার করা এবং দুনিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য তারা অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতের আবিষ্কার করেছে।[৪] যারা উক্ত মতবাদের বিশ্বাসী তাদের মধ্যে অসংখ্য শিরকী, কুফুরী ও বিদ'আতী আক্বীদা রয়েছে। যেমন- (ক) ওয়াহদাতুল ওজূদে বিশ্বাসী, (খ) প্রকৃত ছূফীই আল্লাহ, (গ) যিনি আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ, (ঘ) নবী-রাসূলগণের চেয়ে ছূফীরাই শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। উক্ত বিষয়গুলোর পর্যালোচনা আমরা পূর্বে করেছি।

উল্লেখ্য যে, সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের নামে যত ভ্রান্ত দল ও মাযহাব রয়েছে, সেগুলোর প্রায় সবই ছূফী রোগে আক্রান্ত। যেমন দেওবন্দী মতবাদের যত শাখা-প্রশাখা আছে সবই ছূফীবাদে বিশ্বাসী। তাদের সবচেয়ে বড় শাখা ইলিয়াসী তাবলীগ। অনুরূপ চরমোনাই, হাটহাজারী, পটিয়া প্রভৃতি সবই ছূফী তরীকায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে তাদের চরম বিরোধী ফের্কা ব্রেলভীরা বায়েযীদ বস্তামী, মানছূর হাল্লাজ, ইবনুল আরাবীর খাছ এজেন্ট এবং মূল উত্তরসূরি। কবর, মাযার, খানকা, গাছ, পাথর, মাছ, পুকুর, আগুন, মানুষ, মূর্তি, পীর, ফকীর ইত্যাদি পূজায় তারা খুবই দক্ষ। যিকিরের নামে রাতের মজলিসগুলোতে তারা নারী-পুরুষ একাকার হয়ে নষ্ট জগতে বিলীন হয়ে যায়। আটরশি, দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, চন্দ্রপুরী, মাইজভাণ্ডারী, কুতুববাগী, ফুলতলী প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ খানকা শিরকের উৎপাদন কেন্দ্র। সবার মাঝেই উক্ত ছূফী দর্শনের চর্চা রয়েছে। উক্ত মতবাদের মাধ্যমে যেমন পীর-ফকীরী প্রতারণার জন্ম হয়েছে, তেমনি মুসলিম সমাজে কুফুরী, শিরকী, বিদ'আতী, বিধর্মীয় ও জাহেলী আক্বীদার বিস্তার ঘটেছে।

(দুই) ব্রেলভী তরীকা :

১৮৮০ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে ব্রেলভী মতবাদের জন্ম হয়। হানাফী মাযহাবের অনুসারী এবং ছূফীবাদে বিশ্বাসী আহমাদ রেযা খান (১৮৫৬-১৯২১ খৃঃ) এই মতবাদের জনক। ব্রিটিশ আমলে 'আশেকে রাসূল' নামে এই মতবাদটি পরিচিত ছিল। তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেও তাদের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা।

তিনটি মৌলিক দর্শন থেকে এই মতবাদের জন্ম হয়েছে : (১) প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক মাযহাব, যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এসেছে। (২) খ্রিস্টানদের নিকট থেকে আগত দর্শন হুলূল, যার অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহ্র অনুপ্রবেশ'। হিন্দু মতে, নররূপে নারায়ণ। (৩) হিন্দুদের থেকে আগত ইত্তেহাদ বা ওয়াহাদাতুল উজূদ, যার অর্থ অদ্বৈতবাদী দর্শন, যা হুলূল-এর পরবর্তী স্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে বান্দার সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়া (اَلْفَنَاءُ فِى اللهِ)। ফলে তারা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল সবকিছুই আল্লাহ্র অংশ। আল্লাহ পৃথক কোন সত্তার নাম নয়। নিম্নে এদের কয়েকটি আক্বীদা উল্লেখ করা হল :

(ক) আহমাদ রেযা খান (১৮৫৬-১৯২১ খৃঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর রাখেন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন, কুরআনের ধারক আমাদের সরদার এবং আমাদের মাওলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লাওহে মাহফূযের যাবতীয় কিছু দান করেছেন।[৫]

(খ) তাদের মতে, বর্তমানে নবী করীম (ছাঃ) সৃষ্টির যাবতীয় কর্ম নিজে উপস্থিত থেকে দেখছেন। তিনি নূরের তৈরী এবং সর্বত্র হাযির (উপস্থিত) ও নাযির (দ্রষ্টা)।[৬] আহমাদ ইয়ার খান আরো বলেন, তিনি তাঁর অবস্থানস্থল হতেই দুনিয়ার সবকিছু দেখেন নিজ হাতের তালু দেখার ন্যায়। তিনি নিকটের ও দূরের সব আওয়ায শুনেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী চক্কর দিতে পারেন ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে পারেন এবং আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন।[৭]

---

১. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ১১/৫ ও ৬ পৃঃ।- وَلِأَنَّ غَالِبَ مَنْ تَكَلَّمَ بِاسْمِ الصُّوفِيِّ لَا يَعْرِفُ هَذِهِ الْقَبِيلَةَ وَلَا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إِلَى قَبِيلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ وَقِيلَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ إِنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى لُبْسِ الصُّوفِ ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا ظَهَرَتْ الصُّوفِيَّةُ مِنْ الْبَصْرَةِ

২. মুক্বাদ্দামা ইবনু খালদূন, পৃঃ ৪৬৭; আলী বিন বুখাইত আয-যাহরাণী, আল-ইনহিরাফাতুল আক্বাদিয়া ওয়াল ইলমিয়াহ (মাক্কা মুকাররামা : দারু ত্বাইয়েবাহ, ১৯৯৮), পৃঃ ৪৩৭।

৩. ড. সৈয়দ মাহমূদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, মে ২০০৫), পৃঃ ৪৬২-৪৬৩; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া ১১/৫ ও ৬ পৃঃ।

৪. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, দিরাসাত ফিত তাছাউফ (কায়রো : দারুল ইমাম আল-মুজাদ্দিদ, ২০০৫), পৃঃ ১৫৮-২২৮।

৫. খালেছুল ই'তিক্বাদ, পৃঃ ৩৩।

৬. আহমাদ ইয়ার খান, মাওয়াইযু নাঈমিয়াহ পৃঃ ১৪।

৭. জা-আল হাক্ব ১/১৬০।

(গ) আল্লাহ্র ওলীরা রবের মর্যাদা তুল্য। সুতরাং তাদের থেকেও রহমত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ওলীদের কাছেও দু'আ করা যায়।[৮]

(চার) তাদের বিশ্বাস মতে, রাসূল (ছাঃ) এমন ক্ষমতার অধিকারী, যার মাধ্যমে তিনি সারা দুনিয়া পরিচালনা করে থাকেন। তাদের একজন বড় নেতা আমজাদ আলী ব্রেলভী বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ) হলেন আল্লাহ্র সরাসরি নায়েব (প্রতিনিধি)। সমস্ত বিশ্বজগৎ তাঁর পরিচালনার অধীন। তিনি যা খুশী করতে পারেন এবং যাকে খুশী দান করতে পারেন। যাকে খুশী নিঃস্বও করতে পারেন। তাঁর রাজত্বে হস্তক্ষেপ করা দুনিয়ার কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যে তাঁকে অধিপতি হিসাবে মনে করে না, সে সুন্নাত অনুসরণের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে'। আহমাদ রেযা খান ভক্তির আতিশয্যে লিখেছেন, 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমি আপনাকে আল্লাহ বলতে পারছি না। কিন্তু আল্লাহ ও আপনার মাঝে কোন পার্থক্যও করতে পারছি না'।[৯]

(ঘ) তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ওলী-আওলিয়ারাও দুনিয়া পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। আহমাদ রেযা খান বলেন, হে গাওছ (আব্দুল কাদের জীলানী)! 'কুন' বলার ক্ষমতা লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে, আর আপনি লাভ করেছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে। আপনার কাছ থেকে যা-ই প্রকাশিত হয়েছে তা-ই দুনিয়া পরিচালনায় আপনার ক্ষমতা প্রমাণ করেছে। পর্দার আড়াল থেকে আপনিই আসল কারিগর'।

(ঙ) তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যেহেতু একা, সেহেতু একাই তাঁর পক্ষে পুরো বিশ্বজগৎ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি তাঁর বিশ্ব পরিচালনার সুবিধার্থে আরশে মু'আল্লায় একটি পার্লামেন্ট কায়েম করেছেন। সেই পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৪১ জন। আল্লাহ তাদের স্ব স্ব কাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তন্মধ্যে নাজীব ৩১৯ জন, নাক্বীব ৭০ জন, আবদাল ৪০ জন, আওতাদ ৭ জন, কুতুব ৫ জন এবং একজন হলেন গাওছুল আযম, যিনি মক্কায় থাকেন। উম্মতের মধ্যে আবদাল ৪০ জন। তারা আল্লাহ তা'আলার মধ্যস্থতায় পৃথিবীবাসীর বিপদাপদ দূরীভূত করে থাকেন। তারা আউলিয়াগণের দ্বারা সৃষ্টজীবের হায়াত, রুযী, বৃষ্টি, বৃক্ষ জন্মানো ও মুছীবত বিদূরণের কার্য সম্পাদন করেন।

(চ) আহমাদ রেযা বলেন, যার কাফনে লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু... পূর্ণ কালেমা লেখা হবে, তার কবর যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তার কবরে মুনকার-নাকীর আসবেন না।[১০]

(ছ) তাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈদ হল, ঈদে মীলাদুন্নবী। এই দিন তারা মহা ধুমধামে জশনে জুলূসের আয়োজন করে এবং বিভিন্ন ভক্তিপূর্ণ গান পরিবেশন করে এবং আনন্দ-ফূর্তি করে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনার জন্য এদিনে তারা তথাকথিত সীরাত মাহফিল করে থাকে।

পর্যালোচনা : মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাদের আক্বীদা যে একেবারেই জঘন্য তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ তা'আলা, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও ভণ্ড পীর-ফকীরদেরকে একাকার করে ফেলেছে। তারা মুসলিম নামের কলঙ্ক। তাদের এ সমস্ত কুফরী ফাঁদ থেকে সাবধান থাকতে হবে। ইসলামের লেবাস পরে দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে যে সমস্ত মতবাদ মানুষের ঈমান হরণ করছে, সেগুলোর মধ্যে ব্রেলভী তরীকা সরদারের ভূমিকা পালন করছে।[১১] সুধী পাঠক! এখানে মাত্র কয়েকটি আক্বীদা উল্লেখ করা হল। তাদের মধ্যে এ ধরনের আরো অসংখ্য জাহেলিয়াত রয়েছে।

(তিন) দেওবন্দী তরীকা :

ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর যেলার অন্তর্গত একটি এলাকার নাম 'দেওবন্দ'। এখানে মাওলানা কাসিম নানোতবী (মৃঃ ১৮৭৯ খৃঃ) ১৮৬৮ সালে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার আধ্যাত্মিক গুরু ভারতের ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (মৃঃ ১৮৯৯ খৃঃ)-এর নিকট মুরীদ হন।[১২] অনুরূপ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হিঃ/মৃঃ ১৯৪৩ খৃঃ) এবং মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীও (মৃঃ ১৯০৮ খৃঃ) তার নিকটে বায়'আত করেন এবং মুরীদ হন। উক্ত মাদরাসা ও সেখানকার আলেমদের মাধ্যমে 'দেওবন্দী' মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপমহাদেশের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উক্ত তরীক্বার অনুসারী। তারা কেবল দেওবন্দী ফাতাওয়াকেই অনুসরণ করে। বাংলাদেশে হাটহাযারী, পটিয়া, বগুড়ার জামীল মাদরাসা, নওগাঁর পোরশা মাদরাসা এবং পাকিস্তানে দারুল উলূম করাচি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এই তরীকার প্রচারক। পাকিস্তানের তাকী উসমানী দেওবন্দী তরীকার সবচেয়ে পরিচিত ব্যক্তি। তবে সকলেই ছূফী তন্ত্রে বিশ্বাসী। দেওবন্দী আলেমদের নিকটে বায়েযীদ বুস্তানী, মানছূর হাল্লাজ খুবই প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

উল্লেখ্য যে, দেওবন্দী তরীকার দাওয়াতী শাখা হল, তাবলীগ জামায়াত। আম জনতার মাঝে ছূফী ইমদাদুল্লাহর দর্শন প্রচারের ছদ্মবেশী তরীকা হল এই তাবলীগ। এই জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী দর্শনের পৃষ্ঠপোষক মাওলানা ইলিয়াস (১৮৮৫-১৯৪৪ খৃঃ)। তিনি দেওবন্দী আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর প্রতি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তিনি বলতেন, 'হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী দ্বীনের প্রভূত খেদমত করেছেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা হল, দ্বীনের শিক্ষা হবে তাঁর এবং দাওয়াহর প্রায়োগিক প্রক্রিয়া হবে আমার, যাতে করে তাঁর শিক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে'।[১৩]

অতএব দেওবন্দীদের ব্যাপারে সাবধান থাকা এবং মানুষকে সতর্ক করা একান্ত কর্তব্য। কারণ ইসলামী আক্বীদার সাথে উক্ত ছূফীবাদের কোন সম্পর্ক নেই, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

(চার) তাবলীগ জামায়াত :

১৯২১ সালে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের 'মেওয়াত' এলাকায় 'ফিরোযপুর নিমক' গ্রামে মাওলানা ইলিয়াস (১৩০৩-

৮. আহমাদ ইয়ার গুযরাটী, জা-আল হাক্ব, পৃঃ ৩৩৫; আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর, ব্রেলভী তা'লীমাত (ইউপি, মৌনাতভঞ্জন : ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, জানুয়ারী ২০১৩), পৃঃ ১৬।

৯. হাদায়েক বখশীশ, ২/১০৪।

১০. ফাতাওয়া রিযবিয়া ৪/১২৭ পৃঃ; ব্রেলভী তা'লীমাত, পৃঃ ৪৩।

১১. বিস্তারিত দ্রঃ আল্লামা ইহসান এলাহী যহীর, আল-ব্রেলভিয়াহ : আক্বায়েদ ওয়া তারীখ; ড মানে' আল-জুহানী, আল-মাওসূআহ আল-মুয়াসসারাহ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৩৯৪-৩৯৬ পৃঃ, ফৎওয়া নং ৩০৯০।

১২. ইরশাদুল মুলক, পৃঃ ৩২; সাজিদ আব্দুল কাইয়ূম, তাবলীগ জামা'য়াত ও দেওবন্দিগণ, পৃঃ ৩০।

১৩. মালফূযাতে ইলিয়াস, পৃঃ ৫৮, অনুচ্ছেদ-৫৬।

১৩৬৩হিঃ/১৮৮৫-১৯৪৪ খৃঃ) তাবলীগ জামায়াত প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ফের্কার মূল গ্রন্থ 'তাবলীগী নেছাব', যা 'ফাযায়েলে আমল' বলে পরিচিত। এর লেখক হলেন ইলিয়াস ছাহেবের জামাই, ভাতিজা এবং ছাত্র মাওলানা যাকারিয়া (১৩১৭-১৪০২হিঃ/১৮৯৮-১৯৮২)। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ মোতাবেক ১৩৯৫ হিজরীতে।[14] মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী (১৯১৭-১৯৬৫) প্রণীত এবং মুহাম্মাদ সা'দ কর্তৃক উর্দূ অনুদিত 'মুন্তাখাব হাদীস' বইটিও তাদের অনুসরণীয়। এটি প্রথম ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। তারা দেওবন্দী আলেমদের মতবাদকে সর্বাধিক মূল্যায়ন করে। উক্ত কিতাব ছাড়াও মাওলানা আশরাফ আলীর রচিত 'বেহেশতী যেওর', 'নিয়ামুল কুরআন' ও 'মক্বছূদুল মুমিনীন'কে অনুসরণ করে থাকে।

মাওলানা ইলিয়াস ১৯৪৪ সালের ১২ জুলাই মারা যান। ফলে তার পুত্র মাওলানা ইউসুফ কান্দালভীকে আমীরের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তার মাথায় তার পিতার পাগড়ী পরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকার ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে মারা যান। তার জানাযা পড়ান মাওলানা যাকারিয়া। অতঃপর মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের জামাই মাওলানা ইনআমুল হাসান কান্ধলভী (১৯১৮-১৯৯৫)-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৪ সালে। বাগেরহাট যেলার অধিবাসী মাওলানা আব্দুল আযীযের মাধ্যমে এর সূচনা হয়।[15] আর বার্ষিক ইজতেমার সূচনা হয় ১৯৪৬ সালে। ঢাকা কাকরাইল মসজিদে এর উদ্বোধন হয়। ১৯৪৮ সালে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম হাজী ক্যাম্পে। অতঃপর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর পাগাড় গ্রামের মাঠে বার্ষিক ইজতেমার আয়োজন করা হয়। অতঃপর ১৯৬৭ সাল থেকে তুরাগ নদীর তীরে প্রতি বছর কথিত 'বিশ্ব ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সাবেক ডি আই টি বর্তমানে 'রাজউক'-এর ১২৫ একর জমি ইজতেমার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হত। অবশ্য ১৯৬৭ সালেই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাবলীগ জামায়াতকে এই মাঠ ব্যবহারের মৌখিক অনুমতি দেয়। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতেমা কর্তৃপক্ষকে তিন শতাধিক একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেন।[16]

'ফাযায়েলে আমল' বা তাবলীগী নিছাব নামে দুই খণ্ডে সমাপ্ত একটি কিতাব রয়েছে। সেগুলো পার্ট পার্ট করা হয়েছে। যেমন মূল উর্দূ বইয়ের ধারাবাহিকতা হল : ১. হেকায়েতে ছাহাবা ২. ফাযায়েলে নামায। ৩. ফাযায়েলে তাবলীগ। ৪. ফাযায়েলে যিকর। ৫. ফাযায়েলে কুরআন। ৬. ফাযায়েলে রামাযান। ৭. ফাযায়েলে দরূদ। ৮. ফাযায়েলে ছাদাক্বাত ১ম অংশ। ৯. ফাযায়েলে ছাদাক্বাত ২য় অংশ। ১০. ফাযায়েলে হজ্জ। ১ থেকে ৭ অংশ নিয়ে 'ফাযায়েলে আমল' নামে প্রথম খণ্ড। আর বাকী অংশ নিয়ে 'তাবলীগী নিছাব' ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।[17] উল্লেখ্য যে, বাংলা অনুবাদে শ্রেণী বিন্যাস একটু পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশ নিয়ে পৃথক পৃথক বই ছাপানো হয়েছে। যেমন- ফাযায়েলে দরূদ, ফাযায়েলে হজ্জ।

মূলতঃ মাওলানা ইলিয়াস ছাহেবের স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই উক্ত জামায়াতের সূচনা হয়েছে। যেমন তিনি তার সাক্ষাৎকারে বলেন,

آز کل خواب میں مجہ بر علوم صحیحہ کا القا ہوتا ہی اس لئ کوشش کرو کہ مجھی نیند زیادۃ آئ (خشکی کی وجہ سی نیند کم ہونی لگی تھی تو میں نی حاکیم صاحب اور داکر کی مشورہ سی سر میں تیل مالش کرائ جس سی نیند میں ترقی ہو گئ) آب نی فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقۃ بھی مجہ بر خواب میں منکشف ہوا-

'আজকাল আমার উপরে স্বপ্নে ছহীহ ইলম সমূহ অবতীর্ণ হচ্ছে। এ জন্য চেষ্টা করব যেন আমার বেশী বেশী ঘুম আসে। (আনন্দের কারণে যখন ঘুম কম হতে লাগল, তখন ডাক্তার ও কবিরাজের পরামর্শক্রমে আমি মাথায় তেল মালিশ করলাম)। ফলে ঘুমে ডুবে গেলাম। তিনি বলেন, তাবলীগের এই তরীকাও আমার উপর স্বপ্নে প্রকাশ পেয়েছে'।[18]

সুধী পাঠক! ইসলামের মানদণ্ড বা সংবিধান হল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ, যা নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর। তিনি শেষ নবী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন কিতাব নাযিল হবে না এবং কোন নবী আসবেন না। কোন নীতি-রীতি পদ্ধতি নাযিল হবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু বরণের মাধ্যমে সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে। তাবলীগের পদ্ধতি নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। কিন্তু ইলিয়াস ছাহেব যা দাবী করেছেন, তা মূলতঃ স্বপ্নে পাওয়া উদ্ভট ধর্ম। ইসলাম স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র জীবন বিধান। ইলিয়াসী তাবলীগের মত মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোন বানানো ধর্ম নয়। তাই ইসলামী দাওয়াতের ছহীহ পদ্ধতিই কেবল অনুসরণযোগ্য। স্বপ্নে প্রাপ্ত মিথ্যা ধারণার কোন মূল্য নেই।

তাদের মূল সমস্য আক্বীদা। ছূফীবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় তাদের মধ্যে ছূফীদের দর্শন সবই রয়েছে। যেমন- আক্বীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। তারা মনে করে পৃথিবীর অস্তিত্বশীল সবই আল্লাহর অংশ। অর্থাৎ ওয়াহদাতুল ওজূদে বিশ্বাসী। হায়াতুন্নবী অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) আমাদের ন্যায় কবরে জীবিত আছেন এবং মানুষের কথা শুনেন, উপকার করেন এবং বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহর নবী (ছাঃ) সহ ওলীরাও গায়েব জানেন। রাসূল (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানা পবিত্র। স্বপ্নে প্রাপ্ত বিষয়গুলোও শরী'আত। টঙ্গীর ইজতেমায় অংশগ্রহণ করলে হজ্জ বা ওমরার নেকী পাওয়া যায়। জাল, যঈফ ও ত্রুটিপূর্ণ হাদীছও গ্রহণযোগ্য। এ ধরনের অসংখ্য শিরকী আক্বীদা তাদের মধ্যে রয়েছে। এ সমস্ত আক্বীদা সম্পর্কে

১৪. ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ৭৭।

১৫. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৬), পৃঃ ৯৯।

১৬. ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, পৃঃ ১৪৪-১৪৫।

১৭. ফাযায়েলে আমল বই দ্রঃ।

১৮. মাওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নুমানী, মালফূযাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (লাক্ষ্ণৌ : আল-ফুরকান বুক ডিপু, ২০১০), পৃঃ ৫১, অনুচ্ছেদ-৫০।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। নিম্নে উক্ত জামায়াতের কতিপয় নীতিমালা পেশ করা হল :

(ক) চিল্লা প্রথা :

এক চিল্লা বা চল্লিশ দিন। তিন চিল্লা বা বছরে চার মাস। বছর চিল্লা বা একটি বছর পুরোটাই চিল্লার মাঝে ব্যয় করা। জীবন চিল্লা অর্থাৎ সারা জীবনের জন্য চিল্লায় বেরিয়ে যাওয়া। এছাড়া তিন দিন, সাত দিন এবং দশ দিনের জন্য বের হওয়া।[১৯]

পর্যালোচনা :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উক্ত চিল্লা প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই। ৪০ দিনকে লক্ষ্য করে মূলতঃ 'চিল্লা' শব্দের ব্যবহার। কথিত আছে যে, চল্লিশ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার জন্য চল্লিশ দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে।[২০] হাদীছটি গ্রহণযোগ্য হলেও সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে গিয়ে উক্ত হাদীছের উপর আমল করতে হবে এ ধরনের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা কি কখনো উক্ত হাদীছের উপর আমল করার জন্য চিল্লায় বের হয়েছেন? তাই নতুন নিয়ম আবিষ্কার করে ইসলামের মধ্যে বৈরাগ্যবাদ আমদানি করার কোন সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ এটা ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত, দাওয়াতের সাথে নয়। কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে কেন চিল্লাপ্রথা চালু করা হল?

উল্লেখ্য, 'যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, সে জাহান্নামের আগুন, শাস্তি এবং মুনাফিকের আলামত থেকে মুক্তি পাবে' মর্মে সমাজে যে হাদীছ প্রচলিত আছে, তা মুনকার বা ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[২১] এর সনদে নাবীত্ব ইবনু ওমর নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[২২] তাই উক্ত হাদীছ আমল করা যাবে না। যারা হজ্জ বা ওমরা করতে যান তাদেরকে মদীনায় গিয়ে উক্ত হাদীছের উপর আমল করতে দেখা যায়। এই অভ্যাস অবশ্যই বর্জনীয়।

(খ) গাশত করা।

'গাশত' ফার্সী শব্দ। এর অর্থ ঘোরা-ফেরা, ভ্রমণ করা বা টহল দেয়া। গাশত প্রধানত দুই প্রকার। খুছূছী গাশত বা বিশেষভাবে গমন করা। আর উমূমী গাশত বা ব্যাপকভাবে জামায়াতবদ্ধ হয়ে বের হওয়া। এর আরো কতিপয় প্রকার রয়েছে। যেমন- তা'রূপী গাশত বা পরিচিতি মূলক, তাশকীলী গাশত বা পরিকল্পনা মূলক এবং তা'লীমী গাশত বা শিক্ষা মূলক।

পর্যালোচনা :

এটা ইলিয়াস ছাহেবের নিজস্ব থিওরি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া ফরয দায়িত্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে। তাই উক্ত কাল্পনিক পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে হবে।

(গ) কাশফ।

এর অর্থ অন্তর্দৃষ্টি বা অদৃশ্যের খবর জানা। তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, অলী ও বুযুর্গ ব্যক্তিরা অদৃশ্যের কথা বলতে পারেন। তাদের বইয়ের বহু স্থানে এই কাশফের কথা লেখা আছে। যেমন- আবু ইয়াজিদ কুরতুবী বলেন, আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাযার বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পড়বে, সে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পাবে। আমি একদা আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য সত্তর হাযার বার পড়ে আখেরাতের সম্বল করে রাখলাম। একদা এক যুবক তার কাশফে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পেল। কিন্তু এর সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সে আমাদের সাথে খাচ্ছিল। হঠাৎ সে চিৎকার দিল এবং তার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। সে বলল, আমার মা জাহান্নামে জ্বলছে। আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। আবু ইয়াযীদ বলেন, আমি তার অস্থিরতা লক্ষ্য করলাম। তখন আমি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর একটি নেছাব তার মায়ের জন্য বখশিয়া দিলাম। এটা আমি গোপনেই করেছিলাম। এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষণাৎ বলতে লাগল, চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হতে রক্ষা পেয়েছেন। আবু ইয়াযীদ বলেন, এই ঘটনা হতে আমার দু'টি ফায়দা হল : একটি- সত্তর হাযার বার কালেমা ত্বাইয়েবা পড়ার বরকত। আর দ্বিতীয়তটি হল, যুবকের ঘটনার সত্যতা।[২৩]

পর্যালোচনা :

এটা পরিষ্কার শিরকী আক্বীদা। কারণ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

'আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না এবং তারা এটাও বুঝে না যে তারা কখন পুনরুত্থিত হবে' *(নামল ৬৫)*। এ ধরনের আরো অনেক আয়াত ও হাদীছ রয়েছে।

(ঘ) ছয় উছূল :

(ক) কালেমা (খ) নামায (গ) ইলম ও যিকির (ঘ) ইকরামুল মুসলিমীন (ঙ) তাছহীহে নিয়ত এবং (চ) তাবলীগ। উল্লেখ্য যে, তাবলীগ জামায়াতের সূচনালগ্নে এর সংখ্যা ছিল ষাট।[২৪]

পর্যালোচনা :

উক্ত ছয় উছূল তাবলীগের না তাবলীগ জামায়াতের তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে এটা ইসলামী তাবলীগের নয়। কারণ ইসলামী শরী'আতে এ ধরনের কোন দাওয়াতী উছূলের অস্তিত্ব নেই। তাবলীগ জামায়াত যেহেতু পৃথক একটি মতবাদ বা ধর্ম, তাই মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব তার জন্য পৃথক মূলনীতি আবিষ্কার করেছেন। কিসের ভিত্তিতে উক্ত ছয় উছূল

---

১৯. ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগ জামায়াত, পৃঃ ১২৪-১২৫; গৃহীত : কাকরাইল মসজিদে সংরক্ষিত ১৩ নং নথি।

২০. তিরমিযী হা/২৪১; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৭৯; মিশকাত হা/১১৪৪। عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

২১. আহমাদ হা/১২১২৩; তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৪৪৪।

২২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬৪।

২৩. ফাযায়েলে যিকির (বাংলা), পৃঃ ৪৪১; (উর্দূ), পৃঃ ৩৮৭।

২৪. মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আখতার, তাবলীগ জামায়াত : ঈমানী আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ফেব্রুয়ারী ২০০৬), পৃঃ ৬১; গৃহীত : মাওলানা ওবায়দুল্লাহ, তাবলীগ জামায়াতের প্রাথমিক ইতিহাস, পৃঃ ৬।

নির্ধারণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তাই এগুলোর অনুসরণ করা যাবে না।

(ঙ) 'বিশ্ব ইজতেমা' ও 'আখেরী মুনাজাত'।

উক্ত দু'টি পর্ব তাদের মূল আকর্ষণ। বড় ইজতেমা হোক বা ছোট ইজতেমা হোক সবশেষে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত করে শেষ করা হয়। বিশেষ করে দীর্ঘ দিন যাবৎ বাংলাদেশে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে যে ইজতেমা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়, সেই ইজতেমায় 'আখেরী মুনাজাত' পর্বটি প্রাধান্য পায়। দেশে জ্ঞানী-গুণী ছাড়াও সরকারী আমলাসহ প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন শুধু মুনাজাতের নেশায়।

পর্যালোচনা :

'আখেরী মুনাজাত' নামে শরী'আতে কোন পরিভাষা নেই। ইজতেমা, সম্মেলন, সমাবেশ শেষ করে সকলে মিলে হাত তুলে কথিত মুনাজাত করতে হবে তারও কোন প্রমাণ ইসলামে নেই। এটি বিদ'আতী আমল। বিশেষ করে 'আখেরী মুনাজাত' সবচেয়ে বড় বিদ'আত। এত বড় বিদ'আত আর তৈরি হবে বলে মনে হয় না। তাই একে 'আখেরী বিদ'আত' বলাই শ্রেয়।

জানা আবশ্যক যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আরাফার মাঠে। তাহলে টঙ্গীর মাঠের সম্মেলনকে 'বিশ্ব ইজতেমা' বলা যায় কিভাবে? দ্বিতীয়তঃ আরাফার মাঠে যোহর ছালাতের পূর্বে ইমাম সারগর্ভপূর্ণ ভাষণ দান করে থাকেন এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী দু'আ করেন। অতঃপর যোহর ও আছর ছালাত এক আযানে দুই ইক্বামতে পৃথক পৃথকভাবে দুই দুই রাক'আত করে ক্বছর ছালাত আদায় করেন।[২৫] কিন্তু সেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন মুনাজাত করা হয় না। অথচ আরাফার মাঠ হল দু'আ কবুলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 'উত্তম দু'আ হল আরাফার দিনের দু'আ'।[২৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন ব্যতীত আর কোন দিনে এত মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন না। তিনি তাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব প্রকাশ করেন এবং বলেন, তারা কী চাচ্ছে?[২৭] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ مَلاَئِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ أَتَوْنِيْ شُعْثاً غُبْراً.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন বিকালে আরাফায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ববোধ করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে লক্ষ্য কর, তারা আমার কাছে এসেছে মাথায় এলোমেলো চুল নিয়ে ধূলায় মলিন হয়ে।[২৮] অন্যত্র এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ.

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তার গাযী, হাজ্জী এবং ওমরাকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র মেহমান। আল্লাহ তাদের আহ্বান করেন আর তারা আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দেন। তারা আল্লাহ্র কাছে যা চান, তিনি তাদেরকে তাই দান করেন।[২৯]

সুধী পাঠক! আরাফার মাঠের মত ফযীলতপূর্ণ জায়গায় যদি আখেরী মুনাজাত না হয়, তবে আর কোন স্থানে এই মুনাজাত জায়েয হতে পারে? এরপরেও কি মুনাজাত পাগল বিদ'আতীদের হুঁশ ফিরবে?

(পাঁচ) কাদেরিয়া তরীকা :

এটি আব্দুল ক্বাদের জীলানী (১০৭৮-১১৬৬ খৃঃ)-এর নামে প্রচলিত তরীক্বা। যদিও তিনি কোন তরীক্বার প্রবর্তন করেননি। তার বংশের গাউছ জীলানী নামে এক ব্যক্তি ১৪৮২ খৃস্টাব্দে উক্ত তরীক্বার প্রচলন করেন।[৩০] আর তথাকথিত ভক্তরা উক্ত তরীকার দোহাই দিয়ে আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ)-এর নামে অসংখ্য মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী তৈরি করে সমাজে বাজারজাত করেছে। এভাবে তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। অথচ এ সমস্ত নোংরামির সাথে তাঁর প্রকৃত আক্বীদা ও আমলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

(ছয়) চিশতিয়া তরীকা :

উত্তর ভারতের মুঈনুদ্দীন চিশতী (১১৪২-১২৩৬ খৃঃ)-এর নামে উক্ত তরীক্বার জন্ম হয়। এ তরীক্বা দু'ভাগে বিভক্ত : ১- চিশতীয়া ছাবেরিয়া তরীক্বা, ২- চিশতীয়া নিজামিয়া তরীক্বা।[৩১] মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এবং রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী চিশতিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। আর চরমোনাইয়ের পীর চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার অনুসারী।[৩২]

(সাত) নকশাবন্দিয়া তরীকা :

তুর্কিস্তানের শায়খ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দ (মৃঃ ১৩৮৮ খৃঃ) নকশাবন্দিয়া তরীকার প্রবর্তক ছিলেন। তার অন্যতম শিষ্য খাযা বাকা বিল্লাহ তুর্কিস্তান থেকে দিল্লীতে হিজরত করেন। ১৬০৩ সালে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য, প্রকৃত পীর সৈয়দ আহমাদ কারামত আলীকে নকশাবন্দিয়া তরীকা প্রচারের

২৫. ছহীহ বুখারী হা/১০৮১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭ (ইফাবা হা/১০২০, ২/২৭৯ পৃঃ); বুখারী হা/১৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫, (ইফাবা হা/১৫৫৬), 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৯; মিশকাত হা/২৬১৭, পৃঃ ২৩০, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'আরাফা ও মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন' অনুচ্ছেদ।
২৬. তিরমিযী হা/৩৫৮৫।
২৭. ছহীহ মুসলিম হা/৩৩৫৪; মিশকাত হা/২৫৯৪।
২৮. আহমাদ হা/৮০৩৩; সনদ ছহীহ, ছহীহ তারগীব হা/১১৩২।
২৯. ইবনু মাজাহ হা/২৮৯৩; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮২০।
৩০. মোঃ মোরশেদ আলম, শান্তির পথে বেদনার স্মৃতি (যশোর : আলী লাইব্রেরী, ২০১১), পৃঃ ৫৩।
৩১. মোঃ মোরশেদ আলম, শান্তির পথে বেদনার স্মৃতি (যশোর : আলী লাইব্রেরী, ২০১১), পৃঃ ৫২।
৩২. আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এশ্কে এলাহী, পৃঃ ১১০; ভেদে মা'রেফত বা ইয়াদে খোদা, পৃঃ ৭৮।

অনুমতি প্রদান করেন। ফুরফুরার পীরকে মুজাদ্দেদিয়া তরীকা প্রচারের নির্দেশ দান করেন।[৩৩]

(আট) মুজাদ্দেদিয়া তরীকা :

ইন্ডিয়ার পাঞ্জাবের অন্তর্গত সরহিন্দ নামক শহরে ৯৭১ হিজরীতে আহমাদ বিন আব্দুল আহাদ সারহিন্দী ওরফে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তারই নামে মুজাদ্দেদিয়া তরীকার পরিচিতি লাভ করে। তিনি প্রথমে তার পিতার নিকট থেকে চিশতিয়া তরীকার উপর বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি তার জীবদ্দশায় ৬০ জন ব্যক্তিকে খেলাফত দিয়ে যান। ১০৩৪ হিজরীতে তিনি মারা যান।[৩৪] বাংলাদেশে পরিচিত ফুরফুরার খান্দান মুজাদ্দেদিয়া তরীকার অনুসারী।[৩৫]

পর্যালোচনা : এগুলো সবই মানব প্রণীত ধর্ম। ইসলামের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। তরীকাপন্থীদের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত দ্বীনের কোন মূল্য নেই বলেই তারা এ সমস্ত নিত্য-নতুন তরীকার আবিষ্কার করেছে। এগুলো মূলতঃ মুসলিমদের ঈমান হরণ করার গোপনীয় মারণাস্ত্র।

(নয়) মাইজভাণ্ডারী :

বাংলা ১২৩৩ সালে ১লা মাঘ চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার গ্রামে আহমাদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তির জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় কিছুদিন পড়াশুনা করেন। কিছুদিন ক্বাযীর পদে চাকরী করার পর শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেন। ১৯০৬ সালে বাংলা ১৩১৩ সালের ১০ মাঘ তিনি রাত একটার পর মৃত্যু বরণ করেন।[৩৬]

মাইজভাণ্ডারী পীরের কতিপয় ভ্রান্তনীতি :

(১) গান-বাজনার আসর বসানো (২) কাশফ বা গায়েবী কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং অদ্ভুত কারামত দেখানো (৩) মানুষের আয়ু বৃদ্ধি ও মৃত্যু দান করা। এ ধরনের আরো অনেক শরী'আত বিরোধী কুফরী কার্যক্রম তাদের রচিত বই সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। মাইজভাণ্ডারীর বাণী হিসাবে প্রচার করা হয় যে, 'যে কেহ আমার কাছে সাহায্য চাহিবে- আমি উন্মুক্ত সাহায্য করিব। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক্ জারি থাকিবে'।[৩৭]

পর্যালোচনা :

বাদ্য-বাজনা ইসলামী শরী'আতে হারাম *(সূরা লুকমান ৬-৭)*। শিরক-বিদ'আতমুক্ত ইসলামী গান ছাড়া অন্যান্য অশ্লীল গানও হারাম। অথচ ভণ্ড ফকীরেরা যিকিরের নামে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে রাতের অন্ধকারে গান-বাজনার আসর বসিয়ে থাকে। তারা কখনো ছালাত, ছিয়ামের ধার ধারে না। মানুষকে বিপদগামী করার অভিনব ফাঁদ খুলে বসে আছে। আর পীর ছাহেব আল্লাহ দাবী করে প্রতারণার জাল ফেলে মানুষের নিকট থেকে কোটি কোটি টাকা, লক্ষ লক্ষ গরু, ছাগল, মুরগি লুটপাট করছে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ধনিক শ্রেণীর ব্যক্তিরাই মূলত এই ব্যবসাকে জোরদার করে রেখেছে। তারা দুর্নীতি ও আত্মসাতের পয়সাকে হালাল করার জন্য পীরের দরগায় দান করে এবং মনে করে যে সব ক্ষমা হয়ে গেল।

(দশ) ছারছীনা :

পিরোজপুর যেলার অন্তর্গত নেছারাবাদ উপযেলায় ছারছীনা গ্রাম। উক্ত গ্রামে শাহ ছূফী নেছারুদ্দীন আহমাদ বাংলা ১২৭৯ মোতাবেক ১৮৭৩ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মারা যান।[৩৮] ছূফী ছাহেব ইন্ডিয়ার দেওবন্দ ও সাহারাণপুর মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। ইন্ডিয়ার হুগলী যেলার অন্তর্গত ফুরফুরার পীর মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক্বী (১৮৪১-১৯৩৯ খৃঃ)-এর হাতে তিনি বায়'আত করেন।[৩৯] কথিত ছূফীবাদ প্রচারই তার উদ্দেশ্যে ছিল। তার স্থলাভিষিক্ত পীর একই তরীকা প্রচার করে যাচ্ছেন। উদ্ভট কাশফ ও কারামত প্রকাশের ধোঁকা দিয়ে ভক্তদেরকে শিরক ও বিদ'আতের সাগরে নিক্ষেপ করাই এ তরীকার মূল কর্মসূচী। যেমন-

(ক) 'জনাব সুলাইমান সাহেব এম এ শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর একজন মুরীদ ছিলেন। তিনি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। একবার নিজ বাড়িতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেশ কিছুদিন ঔষধ সেবনের পরও তার রোগের কিছুমাত্র উপশম হল না। তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, সবাই তার জীবনের আশা পরিত্যাগ করল। এমনি অবস্থায় জনৈক পীর ভাই-এর পরামর্শে তার এক আত্মীয় তার এ চরম অসুস্থতার কথা হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলার গোচরীভূত করল। হুজুর বার্তাবাহককে কোন চিন্তা না করে বাড়ি চলে যেতে আদেশ দিলেন। ঠিক ঐ দিনই জনাব সুলায়মান সাহেব অনেকটা অজ্ঞান অবস্থায় তন্দ্রার ঘোরে দেখতে পেলেন কয়েকজন ফেরেশতা নিয়ে হযরত মরহুম পীর ছাহেব কেবলা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রঃ) আকাশ পথে ছুটে আসছেন এবং তার বাড়ির নিকটবর্তী হলে হুজুর কেবলা বললেন- এইখানে। তারপর মনে হল কে যেন তাকে ঔষধ খাওয়ালেন। তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। তখন থেকেই তিনি সুস্থতাবোধ শুরু করলেন এবং আল্লাহর রহমতে অল্পদিনের মধ্যেই সেরে উঠলেন'।[৪০]

(খ) 'নেছারাবাদ থানাধীন স্বরূপকাঠী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্জ জনাব মতিউর রহমান শিকদার ছাহেব বলেন, এক ব্যক্তি সুন্দরবনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। তখন একটি বাঘ তাকে আক্রমণ করতে আসে। সে নিরুপায় হয়ে চিৎকার দিয়ে বলেছিল- খোদা, ছারছীনা পীর ছাহেবের ওসীলায় তুমি আমাকে বাঁচাও। সাথে সাথে সে দেখতে পায়- হঠাৎ কোথা থেকে একটি কেতলি এসে বাঘের সামনে ওঠানামা করতেছিল, এ অবস্থা দেখে বাঘটি ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হুজুরের কাছে এসে সে ব্যক্তি যখন এ ঘটনা ব্যক্ত করছিল তখন হুজুরের নিজের কেতলিটি কাছেই ছিল। হঠাৎ ঐ ব্যক্তি সেটি দেখতে

---

৩৩. আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী, পৃঃ ১১০।
৩৪. মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯), পৃঃ ২, ১৮১, ১৮৩।
৩৫. আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী, পৃঃ ১১০।
৩৬. দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারী ২০১৩ বুধবার, পৃঃ ৮।
৩৭. আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থ অবলম্বনে প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারী ২০১৩ বুধবার, পৃঃ ৮।
৩৮. ডঃ এ. এফ. এম. আনওয়ারুল হক, মুজাদ্দিদে জমান শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র), একটি জীবন একটি আদর্শ (ছারছীনা : দরুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০১১ ইং), পৃঃ ৪২, ৪১৫।
৩৯. মুজাদ্দিদে জমান শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র), একটি জীবন একটি আদর্শ, পৃঃ ৪২৫, ৫৫, ৬০।
৪০. মুজাদ্দিদে জমান শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র), একটি জীবন একটি আদর্শ, পৃঃ ৩৪৪।

পেয়ে চিৎকার করে বলেছিল- হুজুর, আমি সেদিন এ কেতলিটিই সেখানে দেখেছিলাম। এ ঘটনার সাথে হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলা (রঃ)-এর অনুরূপ একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। কোন এক দুর্বৃত্ত একজন মেয়েলোককে একাকী অবস্থায় পেয়ে তাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। মেয়েলোকটি হুজুরের কথা স্মরণ করার সাথে সাথেই দেখতে পেলো একটি বদনা এসে সে দুর্বৃত্ত লোকটিকে আঘাত করল এবং সাথে সাথে সে প্রাণ ত্যাগ করল। হযরত বড় পীর ছাহেব কেবলা (রহঃ) যেখানে বসে ওজু করছিলেন সেখান থেকে ঘটনাস্থল অনেক দূর'।[৪১]

(গ) হুজুর কেবলার ছফর সাথী কামার কাঠির মরহুম মাওলানা আঃ রহমান ছাহেবের থেকে শোনা ঃ লালমনিরহাট জেলার সদর থানার অন্তর্গত দুরাকাঠী গ্রামের হাজী নূর উদ্দীন ছাহেব হজ্জে গিয়ে দেশে ফিরার পূর্ব মুহূর্তে পাসপোর্ট সহ সবকিছু হারিয়ে ফেলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তার এ অবস্থা মসজিদে নববীর খাদেমকে অবহিত করলে তিনি তাকে বললেন, "আপনাদের বাংলাদেশের এক মুরুব্বী এখানে আসেন। তাঁকে ধরলে আপনার সুরাহা হতে পারে। শেষ রাতের দিকে তিনিসহ কয়েকজন একত্রে মিলিত হয়ে মিটিং করেন, আবার চলে যান।" এই মুরুব্বী লোকটি মূলতঃ পীরে মরহুম হযরত মাওলনা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (রহঃ) ছিলেন। খাদেমের নির্দেশমতে নুরুদ্দীন ছাহেব একদিন রাতে জাগ্রত দৃষ্টিতে অপেক্ষা করতে থাকেন। মিটিং শেষে মসজিদে নববী থেকে বের হলে সেই মুরুব্বীর কাছে গিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা পেশ করে কেঁদে ফেলেন। মুরুব্বী লোকটি তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, চক্ষু বন্ধ করুন, আমার হাত সরিয়ে নিলে চক্ষু খুলবেন। কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছেন অনুভব করায় চক্ষু খুলে তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন ঢাকা বাইতুল মোকাররম মসজিদের সামনে। কিছু দিন পর লালমনিরহাটে পীরে মরহুম শাহ্ আবু জা'ফর মুহাম্মদ ছালেহ (রহঃ)-এর একটি জলছা ছিল। উক্ত ব্যক্তি জলছায় তাঁকে দেখেই তিনি চমকে উঠেন- ইনিত সেই ব্যক্তি, যিনি মসজিদে নববী থেকে তাকে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেছিলেন। জলছা শেষ হওয়ার পর লোকটি যখনই হুজুরকে সে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তখন হুজুর কেবলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন- আমি জীবিত থাকতে এ কথা কাউকে প্রকাশ করবেন না। হুজুরের ইন্তেকালের পর উক্ত ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন'।[৪২] উল্লেখ্য যে, এ ধরনের আরো অনেক অলীক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

পর্যালোচনা :

সাধারণ মানুষকে মিথ্যা প্রতারণার জালে আবদ্ধ করার জন্য তাদের কাছে কত যে কৌশল আছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। এ সমস্ত বানোয়াট কাশফ ও কারামতই তাদের ব্যবসার মূল পূজি। এভাবে খানকা শরীফে শিরক-বিদ'আত ও কুফরীর ফাঁদ পেতে অসংখ্য মানুষকে মুশরিক বানাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ধোঁকাবাজ থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন-আমীন!!

(এগার) আটরশি :

ফরিদপুর যেলার সদরপুরে আটরশি গ্রামে বিশ্ব জাকের মঞ্জিল নামে আটরশি পীরের আস্তানা। শাহসূফী হাশমতুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি জামালপুরের অন্তর্গত শেরপুরের পাকুরিয়া গ্রামের জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা আলীমুদ্দীন নোয়াখালী যেলার মাওলানা শরাফত আলীর নিকট তাকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠান। যখন তার বয়স দশ বছর তখন তিনি তাকে আসামের পীর শাহ সূফী ইউনুস আলী এনায়েতপুরীর দরবারে রেখে আসেন। এভাবে তার নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। এক পর্যায়ে ফরিদপুর নিবাসী মুহসিন উদ্দীন খানের সাথে তার পরিচয় ঘটে। তিনি মুহসিন ছাহেবকে এনায়েতপুরীর নিকট নিয়ে যান। অতঃপর এনায়েতপুরীরর নির্দেশে মুহসিন ছাহেবের সাথে শাহসূফী ফরিদপুর চলে আসেন এবং তার তরীকা প্রচার করতে থাকেন। বাংলা ১৩৫৪ সাল থেকে তরীকা প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন।[৪৩]

আটরশি পীরের ভ্রান্ত মতবাদ :

(১) ভাল-মন্দ পীরের হাতে। পীর ছাহেব বলেছেন, এনায়েতপুরী ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলে গেছেন, 'বাবা তোর ভাল-মন্দ উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নেই'।[৪৪]

পর্যালোচনা :

এই আক্বীদা পীরকে সরাসরি আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে দেওয়ার শামিল। অথচ আল্লাহ বলেন, '(হে নবী)! বলুন, সবকিছুই আল্লাহ্র তরফ থেকে হয়' *(নিসা ৭৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান, তবে প্রতিরোধের কেউ নেই' *(ইউনুস ১০৭)*।

(২) পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই। যেমন পীর ছাহেব বলেছেন, 'হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহলেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসতে পারে'।[৪৫]

পর্যালোচনা :

মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম *(আলে ইমরান ১৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করলে, তা কখনোই কবুল করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে-ইমরান ৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন রয়েছে, তাঁর শপথ করে বলছি, এ উম্মতের কেউ যদি আমার আনীত দ্বীন গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করে, সে ইহুদী হৌক বা খৃষ্টান হৌক, অবশ্যই সে জাহান্নামে যাবে।[৪৬]

---

৪১. মুজাদ্দিদে জমান শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র), একটি জীবন একটি আদর্শ, পৃঃ ৩৪৯-৩৫০।

৪২. মুজাদ্দিদে জমান শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (র), একটি জীবন একটি আদর্শ, পৃঃ ৪৩৯-৪৪০।

৪৩. মাহফুযুল হক, সংক্ষিপ্ত ওজিফা (ফরিদপুর, আটরশি : বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ২৮তম সংস্করণ, ১লা মে ২০১১ ইং), পৃঃ ১২-১৫।

৪৪. শাহছুফী হযরত ফরিদপুরী ছাহেবের নসিহত, ৩/১১১ পৃঃ, প্রকাশক : পীরজাদা মোস্তফা আমীর মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ ১লা মে-১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ।

৪৫. আটরশীর কাফেলা, সংকলনে মাহফূযুল হক, আটরশীর দরবার থেকে প্রকাশিত, ৮৯ পৃঃ, সংস্করণ-১৯৮৪, তাসাউফ, তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, ১৪৭ পৃঃ, প্রকাশকাল-২০০০ খৃঃ।

৪৬. মুসলিম হা/১৫৩, মিশকাত হা/১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮, 'ঈমান' অধ্যায়।

মূলতঃ সকল পীরপূজারীই এ বিশ্বাস করে যে, পীর পরকালে তাদের মুক্তির অসীলা হবে। অথচ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) নিজ কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলছেন, হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমাকে রক্ষার জন্য কিছুই করতে পারব না'।[৪৭]

(৩) সংক্ষিপ্ত ওজিফা বইয়ে বলা হয়েছে, 'ফানাফিল্লাহ অর্থ আল্লাহতে বিলুপ্তি। ফানাহ একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা, যে অবস্থায় সূফীসাধক আধ্যাত্মিক উন্নতির এক চরম পর্যায়ে আরোহণ করিয়া পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের সহিত নিজের সর্বস্ব বিলীন করিয়া দেন। ফানার পর্যায়ে সাধকের ব্যক্তিগত সত্তা বলিয়া কিছুই থাকে না। যেহেতু তাঁহার সমস্ত অজুদ (অস্তিত্ব)ই তখন আল্লাহতে বিলীন, এই অবস্থায় সাধকের ইচ্ছা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছারই প্রতিফলন মাত্র'।[৪৮]

পর্যালোচনা :

সুধী পাঠক! কুফর আর শিরকের লালন করতে করতে পীর ও ফকীরেরা মহান আল্লাহর মর্যাদা পর্যন্ত ক্ষুণ্ন করেছে। উপরের ফানাফিল্লাহর দর্শন তারই প্রমাণ। সাধারণ মূর্খ মানুষগুলো না বুঝার কারণে এ ধরনের খানকাগুলোতে পূজা দিতে যায়। তারা জানে না যে, কথিত পীরেরা শিরক ও কুফরের দরস দিয়ে মানুষের ঈমান হরণ করছে। আল্লাহর আনুগত্য থেকে বান্দাকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে।

উক্ত আলোচনায় তাদের আক্বীদা সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেওয়া হল। এছাড়াও ঈমান বিধ্বংসী আরো অনেক বিষয় রয়েছে। তাই উক্ত ভ্রান্ত তরীকা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

(বার) চরমোনাই :

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক বরিশাল শহরের নিকটস্থ কীর্ত্তনখোলা নদীর পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত পশুরীকাটি গ্রামে বাংলা ১৩১২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। চরমোনাই নিবাসী তার চাচাত মামা উজানীর পীরের প্রথম খলীফা আব্দুল জাব্বার ছাহেবের কাছে তিনি লালিত পালিত হন এবং শিক্ষা লাভ করেন। অবশেষে তার একমাত্র মেয়েকে এছহাক্ব ছাহেবের সাথে বিবাহ দেন। উক্ত স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে তাকে পীর ছাহেব চরমোনাই বলা হয়। তিনি বাংলা ১৩৮০ সালের ৩০ ভাদ্র মারা যান।[৪৯] এছহাক্ব ছাহেব ছূফীবাদের বলিষ্ঠ প্রচারক ও সমর্থক ছিলেন। তিনি চিশতীয়া ছাবেরিয়া তরীক্বার অনুসারী। তার রচনাগুলোতে শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারে ভর্তি। 'আশেক মাশুক, ভেদে মারেফত, মা'রেফতের হক্ব, যিকিরে জলি, এস্কে দেওয়ানা, তাবিজের কিতাব ইত্যাদি লেখনীগুলো চরম আপত্তিকর।

দরবারের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মুহাম্মাদ এছহাক শেখ সাদী, রূমী ও মানছূর হাল্লাজের অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন এবং উদাহরণসহ 'ফানাফিল্লাহর' দাবীও করেছেন। যেমন- মানছূর হাল্লাজ যখন আল্লাহ পাকের এস্কের জোশে দেওয়ানা হইতেন তখন তিনি এই শের পড়িতেন- 'ওগো আমার মা'শুক মাওলা! আপনি আপন কুদরাতী নজরে আমার দিকে চাহিয়া দেখুন। আমি এখন আমি নাই। আমি আপনি হইয়াছি, আর আপনি আমি হইয়াছেন। আমি হইয়াছি তন্, আপনি হইয়াছেন জান। আমি শরীর, আপনি প্রাণ। এরপর আর কেহ বলিতে পারে না যে, আমি একজন, আপনি আর একজন। বরং আমি ও আপনি এক হইয়া গিয়াছি, অর্থাৎ আমি আপনার জামালের খুশীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছি, আমার অজুদ ফানা হইয়া গিয়াছে এবং আমার রূহ আপনার নূরের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। আমার আমিও যখন লয় হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর কোথায় আছি? আমি নাই। আপনিই ছিলেন, আপনিই আছেন, আপনিই থাকিবেন। আপনিতো আপনি, আমিও আপনি। আমি বলিতে আর কিছুই নাই'।

অতঃপর তিনি লিখেছেন, 'মনছূর হাল্লাজ এরূপ আল্লাহ পাকের মোরাকাবা করিতে করিতে আল্লাহ্র নূরের মধ্যে গরক হইয়া হঠাৎ একদিন বলিতে লাগিলেন أَنَا الْحَقُّ (আনাল হক;) 'আমিই খোদা'। যে যতই তাহাকে নিষেধ করিল, ঈমান যাওয়ার ও কাফের হওয়ার ভয় দেখাইল; কিন্তু কিছুতেই বিরত হইলেন না ও ঐ কথা থেকে আর ফিরিলেন না। সদা বলিতেই রহিলেন আনাল হক (আমিই খোদা)।[৫০]

পর্যালোচনা :

চরমোনাই পীর কোন্ আক্বীদা পোষণ করতেন তা উক্ত বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। যখন মানছূর হাল্লাজকে উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে, তখন উক্ত তরীকা সম্পর্কে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ মানছূর হাল্লাজ আল্লাহ দাবী করে মুরতাদ হওয়ার কারণে তৎকালীন খলীফা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৫১] তাছাড়া পীর ছাহেবের লেখনীতে অসংখ্য কুফরী আক্বীদা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি শিরক, বিদ'আত ও বিধর্মীয় সংস্কৃতিও স্থান পেয়েছে। তাই উক্ত কুমন্ত্রণা থেকে দূরে থাকতে হবে।

সুধী পাঠক! উক্ত তরীকাগুলো ছাড়াও অসংখ্য তরীকা, মাযহাব ও মতবাদ সমাজে চালু আছে। ইসলামের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ শরী'আতের বিধান তাদের কাছে পসন্দ না হওয়ার কারণেই তারা এ সমস্ত তরীকা ও মাযহাবের আবিষ্কার করেছে। এ সমস্ত ভ্রান্ত ফের্কাই ইসলামী সমাজে শিরক, কুফর ও জাহেলিয়াতের বীজ বোপন করছে।[৫২] তাই প্রকৃত কোন মুসলিম উক্ত মতবাদ, তরীকা ও মাযহাবকে গ্রহণ করতে পারে না। মুসলিম হিসাবে সর্বদা 'ছিরাতে মুস্তাক্বীমের' উপর অটল থাকবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলবে। *(চলবে)*।

---

৪৭. মুসলিম হা/২০৪।

৪৮. সংক্ষিপ্ত ওজিফা, পৃঃ ৯।

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী খাঁন, চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব সৈয়দ মুহাম্মাদ এছহাক (রহ.)-এর জীবনী (ঢাকা : আল-এছহাক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, নভেম্বর ২০০৮ ইং), পৃঃ ১১ ও ৪৮, ৪৯।

৫০. আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রহ.-এর রচনাবলী-২, আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী (ঢাকা : আল-এছহাক পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী ২০০৭), পৃঃ ৪১-৪৩।

৫১. ড. মুহাম্মাদ বিন রবী আল-মাদখালী, হাক্বীক্বাতুছ ছূফিইয়াহ (রিয়ায : ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ১৯; মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী '৯৯, পৃঃ ৬।

৫২. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ লেখক প্রণীত 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন' শীর্ষক গ্রন্থ।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান

-আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

(শেষ কিস্তি)

৮. ছয়জন সৌভাগ্যবান যুবক ও আক্বাবার ১ম বায়'আত :

একাদশ নববী বর্ষে ৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬ জন সৌভাগ্যবান যুবক মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন করেন, যাদের নেতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ তরুণ আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)। বাকী পাঁচজন হলেন (২) আওফ ইবনুল হারিছ (৩) রাফে' বিন মালেক (৪) কুত্বা বিন আমের (৫) উক্ববাহ বিন আমের (৬) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও আলী (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মিনায় তাঁবুতে তাঁবুতে তাওহীদের দাওয়াত দিতে দিতে এক পর্যায়ে তাঁদের নিকটে পৌঁছেন। তারা ছিলেন ইয়াছরিবের জ্ঞানী, চরিত্রবান ও নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের যুবক। তারা ইতিপূর্বে তাদের মিত্র ইহুদীদের নিকট থেকে আখেরী যামানায় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনবার্তা শুনেছিলেন। ফলে রাসূলের দাওয়াত তারা দ্রুত কবুল করে মুসলিম হন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ইয়াছরিবে শান্তি স্থাপিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তাঁকে ইয়াছরিবে হিজরতের আমন্ত্রণ জানান। সাথে সাথে এই যুবকগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অঙ্গীকার করেন যে, 'আমরা নিজ জাতির নিকট গিয়ে আপনার নবুওয়াতের কথা প্রচার করব। হজ্জ থেকে ফিরে উক্ত ছয়জন যুবকের ক্ষুদ্র দলটি ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন।

ফলে পরবর্তী বছর দ্বাদশ নববী বর্ষের যিলহজ্জ মাস মুতাবিক ৬২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হজ্জের মৌসুমে জাবের বিন আব্দুল্লাহ ব্যতীত পুরোনো ৫ জন ও নতুন ৭ জন মোট ১২ জন যুবক এক গভীররাতে মিনার পূর্ব নির্ধারিত আক্বাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত করেন। মিনার পশ্চিম দিকের এই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ দিয়ে মক্কা থেকে মিনায় যাতায়াত করতে হয়। এই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথকেই আক্বাবা বলা হয়। উপস্থিত নতুন ৭ জন যুবক হলেন (১) মুছ'আব ইবনুল হারেছ (২) যাকওয়ান ইবনু আব্দিল ক্বায়েস (৩) ওবাদা বিন ছামেত (৪) ইয়াযীদ বিন ছা'লাবা (৫) আব্বাস বিন ওবাদা বিন নাযলা (৬) আবুল হায়ছাম বিন তায়হান (৭) 'ওয়ায়েম বিন ছাঈদা। এদের সবাই ছিলেন খাযরাজী ও ২ জন ছিলেন আউস গোত্রের। এটাই হল আকাবার প্রথম বায়'আত।[৫৩]

এখানে জামরায়ে কুবরা অবস্থিত। এখানেই ইবরাহীম (আঃ) ইবলীসকে প্রথম পাথর মেরেছিলেন। আর এখানেই ইসমাঈল বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানবরূপী শয়তানদের বিরুদ্ধে সকল বিধান বাতিল করে অহি-র বিধান কায়েমের জন্য ঐতিহাসিক বায়'আত গ্রহণ করেন। ফলে যুবকদের মধ্যে দাওয়াতের প্রেরণা জাগ্রত হয়। অতঃপর তাদের দাওয়াতেই মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরতের পথ সুগম হয়। যুবকদের এই আক্বীদার বিপ্লবই পরবর্তীতে শুধু মক্কা ও মদীনা নয়; বরং বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছুতেই ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে ও অবশেষে তা সার্বিক সমাজ বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন আগত খ্যাতনাম যুবক ছাহাবী উবাদা বিন ছামিত আনছারী (রাঃ) উক্ত বায়'আতের বর্ণনা দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ডেকে বলেন, এসো! আমার নিকট তোমরা একথার উপর বায়'আত কর যে, (১) তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না (২) চুরি করবে না (৩) ব্যভিচার করবে না (৪) তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না (৫) কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না (৬) শরী'আত সম্মত কোন বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এগুলো পূর্ণ করবে তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ সবের কোন একটি করে, অতঃপর দুনিয়াতে তার (আইনসঙ্গত) শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে সেটি তার জন্য কাফ্ফারা হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ এগুলোর কোনটি করে। অতঃপর আল্লাহ তা ঢেকে রাখেন; তবে ব্যাপারটি আল্লাহ্র মর্জির উপরে নির্ভর করবে। চাইলে তিনি শাস্তি দিবেন, চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন। রাবী বলেন, আমরা একথাগুলোর উপরে তাঁর নিকটে বায়'আত করলাম।[৫৪]

বায়'আতে বর্ণিত ছয়টি বিষয় তৎকালীন আরবীয় সমাজে যেমন প্রকটভাবে বিরাজমান ছিল বর্তমানের কথিত সভ্য সমাজেও তা প্রকটভাবে বিরাজ করছে। অথচ এগুলো থেকে বিরত থাকলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হত। অন্যথা সমাজ ও রাষ্ট্রে কাঙ্খিত শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) যুবকদেরকে জ্ঞানী, চরিত্রবান ও দূরদর্শী হতে হবে।

(খ) সর্বপ্রথম যুবকদের দাওয়াতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধ-বিগ্রহে ক্ষতবিক্ষত মদীনায় হিজরত করেন এবং তথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তাক্বওয়াশীল আমীরকে হক্ব প্রতিষ্ঠায় সার্বিক পরামর্শ দেওয়া এবং সার্বিক সহযোগিতা করা যুবকদের কর্তব্য।

(গ) যুবকদের বায়'আত গ্রহণ ও নিঃশর্ত দাওয়াতের ফলে মক্কা মদীনাসহ পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বের সবকিছুতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সার্বিক বিপ্লব সাধিত হয়। সুতরাং এ যুগের যুবকদেরকেও দাওয়াত ও জিহাদের পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

(ঘ) শিরক-বিদ'আত, চুরি, হত্যা, অপবাধ, অবাধ্যতা ইত্যাদি অপকর্ম থেকে দূরে থাকা।

৯. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দাঈ যুবক মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) :

আক্বাবায় ১ম বায়'আতে অংশগ্রহণকারী নওমুসলিম যুবক ছাহাবীদের অনুরোধে মহানবী (ছাঃ) উদ্যমী ও ধীশক্তি সম্পন্ন যুবক মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)-কে শিক্ষক ও দাঈ হিসাবে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে মদীনায় প্রেরিত প্রথম দাঈ।

মুছ'আব ছিলেন মক্কার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের দুলাল। তিনি যখন ঘোড় সওয়ার হতে বের হতেন তখন তাঁর আগে পিছে গোলামের দল থাকত। দু'শ দিরহামের কমমূল্যের কোন পোশাক তিনি পরতেন না। অথচ ইসলাম গ্রহণ করায় তার মা তার খানাপিনা বন্ধ করে দেন এবং তাকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেন। বিলাস-ব্যসনে লালিত পালিত এই যুবক অবশেষে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে অস্থি-চর্মসার ও কঙ্কাল সর্বস্ব হয়ে

৫৩. আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ ১২৩; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইক্বামতে দ্বীন ঃ পথ ও পদ্ধতি (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ২০০৪), পৃঃ ১৮।

৫৪. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৮, ঈমান অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭, ১/২৪ পৃঃ।

পড়েছিলেন। তিনি ইয়াছরিবে গিয়ে তরুণ দলনেতা আবু উমামা আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং উভয়ে মিলে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। তাঁকে মুকরী (مُقْرِئٌ) অর্থাৎ পাঠদানকারী বা শিক্ষক বলে ডাকা হত। তাঁর দাওয়াতের ফল এই হয়েছিল যে, পরবর্তী হজ্জ মৌসুম আসার সময়কালের মধ্যেই ইয়াছরিবের আনছারদের মধ্যে এমন কোন বাড়ী ছিল না, যার পুরুষ ও মহিলাদের কিছু সংখ্যক মুসলিম হননি। তাঁর প্রচারকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নিম্নরূপ :

একদিন আস'আদ বিন যুরারাহ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বনু আব্দুল 'আশহাল ও বনু জা'ফরের মহল্লায় গমন করেন ও সেখানে একটি কূয়ার পাশে কয়েকজন মুসলিমকে নিয়ে বসেন। তখন পর্যন্ত বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের দুই নেতা সা'দ বিন মু'আয ও উসায়েদ বিন হুযায়ের ইসলাম কবুল করেনি। মুবাল্লিগদের আগমনের খবর জানতে পেরে সা'দ উসায়েদকে বললেন, 'আপনি গিয়ে ওদের নিষেধ করুন যেন আমাদের সরল সিধা মানুষগুলোকে বোকা না বানায়। আস'আদ সে আমার খালাতো ভাই না হলে আমি নিজেই যেতাম! উসায়েদ বর্শা উঁচিয়ে সদর্পে সেখানে গিয়ে বললেন, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে এক্ষুণি পালাও। তোমরা আমাদের বোকা মানুষগুলোকে মুসলিম বানাচ্ছ। মুছ'আব শান্তভাবে বললেন, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসুন ও কথা শুনুন। যদি পসন্দ না হয় তখন দেখা যাবে। উসায়েদ তখন মাটিতে বর্শা গেড়ে দিয়ে বসলেন। অতঃপর মুছ'আব তাকে কুরআন থেকে কিছুটা পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি আল্লাহ্র বড়ত্ব, মহত্ব এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। ইতিমধ্যে উসায়েদ চমকিত হয়ে বলে উঠলেন, ما احسن هذا واجمله 'কতইনা সুন্দর কথা এগুলো ও কতই না মনোহর'। এরপর তিনি সেখানেই ইসলাম কবুল করলেন।

অতঃপর তিনি সা'দ বিন মু'আযের নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের মধ্যে অন্যায় কিছু দেখিনি। তবে আমি তাদের নিষেধ করে দিয়েছি এবং তারাও বলেছে, আপনারা যা চান তাই করা হবে। এ সময় উসায়েদ চাচ্ছিলেন যে, সা'দ সেখানে যাক। তাই তাকে রাগানোর জন্য বললেন, আমি জানতে পারলাম যে, বনু হারেছাহ্র লোকজন আস'আদ বিন যুরারাহকে হত্যা করার জন্য বের হয়েছে এজন্য যে, সে আপনার খালাতো ভাই। সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই বর্শা হাতে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, আস'আদ ও মুছ'আব নিশ্চিন্তে বসে আছে। বনু হারেছাহ্র হামলাকারীদের কোন খবর নেই। তখন তিনি বুঝলেন যে, উসায়েদ তার সঙ্গে চালাকি করেছে তাকে এদের কাছে পাঠানোর জন্য। তখন সা'দ ক্রুদ্ধ স্বরে উভয়কে ধমকাতে থাকলেন এবং আস'আদকে বললেন, 'তুমি আমার আত্মীয় না হলে তোমাদের কোনই ক্ষমতা ছিল না আমার মহল্লায় এসে লোকদের বাজে কথা শুনাবার'। আস'আদ পূর্বেই সা'দ ও উসায়েদের বিষয়ে মুছ'আবকে অবহিত করেছিলেন যে, এরা দু'জন মুসলিম হলে এদের গোত্রের সবাই মুসলিম হয়ে যাবে। আস'আদের ইঙ্গিতে মুছ'আব অত্যন্ত ধীর ও নম্র ভাষায় সা'দকে বললেন, আপনি বসুন এবং আমাদের কথা শুনুন! অতঃপর পসন্দ হলে কবুল করবেন, নইলে প্রত্যাখ্যান করবেন। অতঃপর তিনি বসলেন এবং মুছ'আব তাকে কুরআন থেকে শুনালেন ও তাওহীদের মর্ম বুঝালেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সা'দ বিন মু'আয ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। অতঃপর সেখানেই দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে এলেন ও সবাইকে ডেকে বললেন, হে বনু আব্দুল আশহাল! كيف تعلمون امري فيكم 'তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর'। তারা বলল, انت سيدنا وافضلنا رأيا وايمننا نقيبته 'আপনি আমাদের নেতা, সর্বোত্তম সিদ্ধান্তের অধিকারী ও নিশ্চিন্ততম কাণ্ডারী'। তখন তিনি বলেন, ان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتي تومنوا بالله وبرسوله 'তোমাদের নারী ও পুরুষ সকলের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনবে'। একথার প্রতিক্রিয়া এমন হল যে, সন্ধ্যার মধ্যে সবাই ইসলাম কবুল করল একজন ব্যতীত। যার নাম ছিল উছাইরাম (الاصيرم)। ইনি পরে ওহোদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও শাহাদতবরণ করেন। কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করা ব্যতীত আল্লাহ্র জন্য একটা সিজদা করারও সুযোগ তিনি পাননি। রাসূল (ছাঃ) তার সম্পর্কে বলেন, عمل قليلا واجر كثيرا 'অল্প আমল করল ও পুরস্কার অধিক পেল'।[৫৫] বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও অন্যকে আকৃষ্ট করার অনন্য গুণাবলী সম্পন্ন যুবক মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) এভাবেই ইসলাম প্রচারে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, যা সকল যুগের যুবকদেরকে হক্ব প্রচারে অনুপ্রাণিত করবে। পরবর্তীতে তিনি ওহোদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) পথভোলা মানুষকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ দেখাতে যুবকরাই সর্বপ্রথম 'দাঈ ইলাল্লাহ'-এর ভূমিকা পালন করেছে। এযুগেও মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাতে যুবকদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও রিসালাতের পথে দাঈর ভূমিকা পালন করতে হবে।

(খ) দ্বীনে হক্বের পথে পারিবারিক বাধা আসা স্বাভাবিক। ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীর ভোগ-বিলাসকে পদদলিত করতঃ চিরস্থায়ী সুখের আশায় পারিবারিক ও সামাজিক বাধাকে তুচ্ছ মনে করে আল্লাহ্র পথে অটল থাকতে হবে এবং সে পথে দাওয়াত দিতে হবে।

(গ) দাঈর জন্য বদ মেজায ও রুক্ষ স্বভাব ত্যাগ অপরিহার্য। অতএব হিকমতের সাথে নম্র ও ভদ্র ভাষায় আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে।

১০. জান্নাতের আকাঙ্খী যুবক উমায়ের বিন হোমাম :

কাফির, মুশরিক ও মুসলিমদের মধ্যে প্রথম ফায়ছালাকারী যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ। ২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান মুতাবিক ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ সংঘটিত এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম যুবকদের জান্নাতের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন, قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'তোমরা এগিয়ে চল ঐ জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত'। রাসূলের এ আহ্বানে যুবকদের মাঝে ঈমানের গতি বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল ও শতগুণে বেড়ে গেল। তিনি আরো বললেন,

وَالَّذِي نَفْسِيْ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمْ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি আজকে দৃঢ়পদে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে লড়াই করবে, পিছপা হবে না, সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হবে। অতঃপর যদি সে নিহত হয়,

৫৫. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৪/৩, ডিসেম্বর ২০১০, পৃঃ ৭-৮।

তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন'। এ কথাগুলো শুনে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী যুবক উমায়ের বিন হোমাম বলে উঠলেন, 'বাখ বাখ' (বেশ বেশ)। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একথা বললে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ঐ জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হব, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে একথা বলিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا 'নিশ্চয় তুমি তার অধিবাসী'। একথা শুনে ঐ যুবক ছাহাবী তার থলি হতে খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু জান্নাত পাগল এই ছাহাবীর আর দেরী সইছে না। তিনি বলে উঠলেন, لَئِنْ أَنَا حَيِّيْتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِيْ إِنَّهَا الْحَيَاةُ طَوِيْلَةٌ 'যদি আমি এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে সেটাতো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে, বলেই তিনি তার সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলেন।[৫৬]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য হতে হবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ।

(খ) ইসলামী দলের নেতার উচিত তার কর্মীবাহিনীকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী প্রাচুর্য লোভ-লালসা, ক্ষমতাদখল ইত্যাদির প্রতি উৎসাহিত না করে সর্বদা চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত করা।

(গ) জান্নাত পাগল একদল মুমিন যুবকের মাধ্যমেই বাতিলের পরাজয় সূচিত হয়েছে এবং তদস্থলে হক্বের পতাকা উড্ডীন হয়েছে। তাই যুবকদেরকেই যাবতীয় মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করতে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে।

১১. আবু জাহলকে হত্যাকারী দুই কিশোর :

বদর যুদ্ধে আবু জাহলের তর্জন গর্জন ও আত্মম্ভিরতা অসার প্রমাণিত হয়েছিল আনছারদের বানু সালামাহ গোত্রের কিশোর দু'ভাই মু'আয ও মু'আব্বিয বিন আফরার বীরদর্পে আক্রমণের মাধ্যমে। আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি সৈন্যদের সারিতে ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ আমার ডানে ও বামে দু'জন তরুণ আনছারীকে দেখতে পেলাম। তখন মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলাম কতই না উত্তম হত যদি আমি এ দুই তরুণ অপেক্ষা বীর যোদ্ধাদের মধ্যে দাঁড়াতাম। ইত্যবসরে তাদের একজন আমাকে বললেন, আপনি কী আবু জাহলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে তাকে তোমার প্রয়োজন কী? সে বলল, শুনেছি সে নাকি রাসূল (ছাঃ)-কে গালি দেয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, যদি তাকে দেখতে পাই, তাহলে আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তার ও আমার দেহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তারা প্রত্যেকে গোপনভাবে এসে চাচাজীর কানে কানে একই কথা বলল। আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, তাদের কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম এবং ওদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফলে দেখিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। আমাদের কথাবার্তা শেষ না হতেই দেখতে পেলাম আবু জাহল লোকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে। তখন আমি তরুণদ্বয়কে বললাম, তোমরা উভয়ে যার সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়েছ, ঐ সে ব্যক্তি।

তখন ওরা দু'জন তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং মু'আয প্রথম আঘাতেই আবু জাহলের ঘাড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এ সময় ইকরিমা বিন আবু জাহল তার কাঁধে তরবারি দ্বারা আঘাত করে। ফলে মু'আযের একটি হাত কেটে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে গেল এবং যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। ফলে সে নিজের পা দ্বারা চেপে ধরে সেটাকে একটানে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর ছোট ভাই মু'আব্বিযের আঘাতে আবু জাহল ধরাশায়ী হলে, তারা উভয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে গর্বভরে বলল, আমিই আবু জাহলকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কী তোমাদের তরবারী মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। তারপর উভয়ের তরবারী পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كِلاَهُمَا قَتَلَهُ 'তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ'।[৫৭] পরে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) গিয়ে দেখেন যে, আবু জাহলের নিশ্বাস তখনও চলছে। তিনি তার দাড়ি ধরে মাথা কেটে নেবার জন্য ঘাড়ে পা রাখেন এবং কিছু কথোপথনের পর তা কেটে নিয়ে রাসূলের দরবারে হাযির হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে উঠেন, اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ 'আল্লাহ্র শপথ! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। একথা তিনবার বলার পর তিনি বললেন, اَللهُ أَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ 'আল্লাহ আকবার! যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু সেনা দলকে একাই পরাভূত করেছেন'।

এভাবে মক্কার বড় দুশমন আবু জাহল মুসলিম তরুণদের দ্বারাই পৃথিবী থেকে খতম হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃতদেহ দেখার পর বলেন, رَحِمَ اللهُ ابْنَيْ عَفْرَاءَ فَهِمَا شُرَكَاءُ فِيْ قَتْلِ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةُ 'আল্লাহ আফরার দুই পুত্রের উপর রহমন করুন। তারা এই উম্মতের ফেরাউনকে হত্যার অংশীদার ছিল'। অন্য অংশীদার ছিলেন ফেরেশতা ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।[৫৮]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) কিশোর ও তরুণদেরকে সর্বদা হক্বের পথে উদ্যোমী হতে হবে এবং দৃঢ়পদে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

(খ) বাতিলের পতাকাধারী যতবড়ই বীর বাহাদুর হোক না কেন তাদের পতন সুনিশ্চিত। অতএব বাতিলের ধ্বজাধারীরা সাবধান!

(গ) ইসলামী শক্তি ও হক্বের পতাকা উড্ডীন করতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

১২. গাসীলুল মালায়েকা হানযালা (রাঃ) :

পার্থিব জীবনে কামনা বাসনা, সুখ ও স্বাচ্ছন্দকে ধূলায় ধুসরিত করে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বুকের তাজা রক্ত প্রবাহিত করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করেননি ঈমানী তেজে বলীয়ান যুবকরা। তারও বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখতে পাই ছাহাবীদের বিস্ময়কর জীবনে। ওহুদ যুদ্ধের ঘোষণা শুনে সদ্য বিবাহিত যুবক হানযালা বিন আবু আমের আর-রাহিব বাসর ঘর থেকেই জিহাদের জন্য

৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১০, 'জিহাদ' অধ্যায়; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২১৮; আত-তাহরীক ১৪/১১ মার্চ ২০১১, পৃঃ ১০।

৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০২৮; আর রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২২০-২১; আত-তাহরীক ১৪/৬, মার্চ-১১, পৃঃ ১১।

৫৮. আর রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২২০-২১; আত-তাহরীক ১৪/৬, মার্চ-২০১১, পৃঃ ১১-১২।

বেরিয়ে পড়েন। ত্যাগের প্রতি অপূর্ব দৃষ্টান্ত! অথচ তার পিতা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে হিজরতের পূর্বে মদীনার আউস গোত্রের সরদার ও ধর্ম যাজক ছিল। হিজরতের পরে সে মক্কায় চলে যায় এবং কুরায়েশদের পক্ষে ও মুসলিমদের বিপক্ষে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ জন্য রাসূল (ছাঃ) তাঁর লক্বব দেন 'আবু আমের আল-ফাসেক'।

যাহোক হানযালা (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শত্রু বাহিনীর সারিগুলো তছনছ করে মধ্যভাগে পৌঁছে যান। অতঃপর কুরায়েশ সেনাপতি আবু সুফিয়ানের মাথার উপর তরবারী উত্তোলন করে তাকে খতম করে দেবার জন্য। কিন্তু মহান আল্লাহ সেই সময় তাঁর ভাগ্যে শাহাদত লিখে রেখেছিলেন। তাই সেই মুহূর্তে শত্রুসৈন্য শাদ্দাদ বিন আউসের আঘাতে তিনি ধরাশয়ী হন ও শাহাদত বরণ করেন।

যুদ্ধ শেষে হানযালার মৃতদেহ অদৃশ্য ছিল। অনেক সন্ধানের পর এক স্থানে এমন অবস্থায় পাওয়া যায় যে, যমীন হতে উপরে রয়েছে এবং তা হতে টপ টপ করে পানি পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ফেরেশতারা তাকে গোসল দিচ্ছেন'। পরে তার স্ত্রীর কাছে প্রকৃত ব্যাপারটি জানা যায় যে, তিনি নাপাকির গোসল ছাড়াই যুদ্ধের ময়দানে ছুটে এসেছিলেন। ফলে তখন থেকে হানযালা (রাঃ) 'গাসীলুল মালায়েকা' (غسيل الملائكة) 'ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসলকৃত' বলে অভিহিত হন।[৫৯]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) জান্নাত পিয়াসী যুবকের নিকট দুনিয়াবী যে কোন চাওয়া-পাওয়া একেবারেই তুচ্ছ।

(খ) পিতা, পুত্র, স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি যে কোন পারিবারিক বাধা ও আকর্ষণকে পদদলিত করে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী মুমিনের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

(গ) জীবনের যে কোন মুহূর্তে ইসলামের আহ্বানে দ্বীনে হক্ব প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে।

১৩. শাহাদতের পূর্বে ত্যাগের বিরল মহিমা :

জান্নাতের অফুরন্ত নে'মতের তুলনায় দুনিয়াবী ভোগ বিলাস একেবারেই তুচ্ছ। পরার্থে জীবন বিলিয়ে দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে ইসলামী আদর্শের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম যুবকগণ। যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নিম্নের ঘটনার মাধ্যমে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয় ইয়ারমুকের যুদ্ধ। যুদ্ধের বিশাল ময়দানের এক প্রান্তে ক্ষুদ্র মুসলিম সেনাদল এবং অন্য প্রান্তে রোমকদের বিশাল সৈন্যবাহিনী। যুদ্ধ শুরুর আগে মু'আয বিন জাবাল, আবু ওবায়দা, আমর ইবনুল 'আছ, আবু সুফিয়ান, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী মুসলিম সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেন। আবু ওবায়দা (রাঃ) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগলকে স্থির রাখবেন। ...তোমাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা মনে মনে আল্লাহ্র যিকির করতে থাকবে'।

অতঃপর উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। অবশেষে আল্লাহ্র রহমতে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। যুদ্ধের ময়দানে আবু হুযায়ফা (রাঃ)-এর সাথে সামান্য পানি নিয়ে আহতদের মাঝে তার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে শুরু করলেন। শেষে তিনি তাঁর চাচাতো ভাইকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তার শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিল এবং অবস্থা ছিল আশংকাজনক। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি পানি পান করবে? সে কথার কোন উত্তর দিতে সক্ষম না হয়ে হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করল। আহত মুসলিম যুবক চাচাতো ভাই হুযায়ফার কাছ থেকে পানি পান করার জন্য হাতে নিতেই তার পাশে এক সৈন্যকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনল। পিপাসার্ত ঐ সৈনিকের বুকফাঁটা আর্তনাদ শুনে তার পূর্বে তাকে পানি পান করানোর জন্য ইঙ্গিত করল। হুযায়ফা (রাঃ) তার নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি পানি পান করতে চান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি পানি পান করার জন্য পাত্র উপরে তুলে ধরতেই পানির জন্য অন্য একজন সৈন্যের চিৎকার শুনতে পেলেন। ফলে তিনি পানি পান না করে হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিও। হুযায়ফা (রাঃ) আহত সৈন্যটির কাছে গিয়ে দেখলেন সে মারা গেছে। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে এসে দেখলেন সেও মারা গেছে। অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিলে আসলে দেখেন সেও শাহাদতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতবাসী হয়ে গেছে। পানির পাত্রটি তখনও হুযায়ফা (রাঃ)-এর হাতে। অথচ তা পান করার মত এখন আর কেউ বেঁচে নেয়। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেক জনের পানির পিপাসা মিটানোর জন এতই পাগল হয়ে উঠেছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারেনি। অথচ সবার প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত।[৬০]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) মুসলিম যুবকের হৃদয় সর্বদা স্বার্থপর না হয়ে পরোপকারী হয়। তাই নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

(খ) যে কোন সংকট মুহূর্তে আপন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই স্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি হবে।

(গ) সর্বদা মনে রাখতে হবে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেক আমরা পরের তরে'।

উপসংহার :

পরিশেষে বলতে পারি যে, তাক্বওয়াশীল যুবকদের মাধ্যমেই যুগে যুগে ইসলামের চিরকল্যাণের বিধান প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বাতিলের পরাজয় সূচিত হয়েছে। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জান্নাত পাগল মুমিন যুবকদের নিয়েই বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবুক ও অন্যান্য যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। অথচ বর্তমানে মুসলিম যুবসমাজ তাদের সেই গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে বাতিলের পাতানো ফাঁদে পড়ে অনৈতিক ভোগ-বিলাস, অশ্লীল গান, নগ্ন ছবি ও মদ, জুয়া ইত্যাদিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এতে তারা দু'জাহানের ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। তাই আল্লাহ্র দেওয়া পবিত্র আমানাত যৌবনকালের প্রতি ফোঁটা রক্ত, প্রতিটি ধাপ, চিন্তা, চেতনা ও কর্মক্ষমতাকে আল্লাহ্র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করতে হবে। তবেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র শান্তি ও কল্যাণে ভরে যাবে এবং পরকালের ভয়াবহ দিনে আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

[লেখক : কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

৫৯. আর রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৬২; আত-তাহরীক ১৪/৯, জুন ১১, পৃঃ ১৪।

৬০. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৭/৮-১১ পৃঃ।

পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার

-বযলুর রহমান

(৩য় কিস্তি)

গোসলের শিষ্টাচার

অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, আভ্যন্তরীণ নিষ্কলুষতা, মানসিক প্রফুল্লতা ও স্বাভাবিক জীবন-যাপনের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হল গোসল। গোসল (الغسل) অর্থ ধৌত করা।[৬১] পরিভাষায় গোসল অর্থ পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ওযূ করে সর্বাঙ্গ ধৌত করা।[৬২] কিন্তু সভ্যতাগর্ভী পাশ্চাত্য সমাজের সভ্য (?) মানুষেরা গোসলের কোন ধার ধারে না। তারা গোসলের পরিবর্তে আধুনিকতায় উদ্ভাসিত বিভিন্ন বডি ফ্রেশ, বডি লোশন ও কসমেটিকস ব্যবহার করে থাকে। যার মাধ্যমে সাময়িক দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। কিন্তু স্থায়ীভাবে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। যা জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। অথচ ইসলাম প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে গোসলের উপকারিতা বর্ণন করেছে। আর ইসলামী শরী'আতে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল গোসল। নিম্নে গোসলের শিষ্টাচার উল্লেখ করা হল।

১. নিয়ত করা :

গোসলের পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করতে হবে। কারণ মানুষের সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[৬৩]

২. বিসমিল্লাহ বলা ও হাত ধৌত করে ওযূ করা :

গোসলের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে ছালাতের ন্যায় ওযূ করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ.

'আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন প্রথমে হাত ধৌত করতেন অতঃপর ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন...'।[৬৪]

৩. গোসলের সময় আড়াল/পর্দা করা :

পুকুর-পুষ্করিণী, খাল-বিল প্রভৃতি খোলা ময়দানে গোসল করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো খোলা ময়দানে গোসল করেননি। তবে পুকুর যদি আড়াল বা পর্দা করা থাকে তাহেল সমস্যা নেই। হাদীছে এসেছে,

(١) عَنْ يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

(১) ইয়ালা ইবনু মুররা (রাঃ) হতে বণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে উন্মুক্ত স্থানে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহন করলেন। তারপর খুৎবা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ বড় লজ্জাশীল ও পর্দাকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও পর্দাকারীকে ভালবাসেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে সে যেন পর্দা করে'।[৬৫]

(٢) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَتْ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أُمُّ هَانِئٍ.

(২) উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়েছিলাম। তখন তাকে গোসলরত অবস্থায় দেখলাম। আর এমতাবস্থায় ফাতেমা তাকে কাপড় দিয়ে আড়াল বা পর্দা করে রেখেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, উনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী।[৬৬] সুতরাং খোলা ময়দানের পরিবর্তে বাথরুম কিংবা কোন ঘেরাও পরিবেশে গোসল করা উচিত। সে জন্য প্রয়োজনে পুকুর থেকে পানি উঠিয়ে আনতে হবে।[৬৭] আর যরূরী ভিত্তিতে বাড়ির মধ্যে বাথরুম বা গোসলখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. গোসল ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্রতা অর্জনসহ প্রত্যেক ভাল কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করতেন। গোসল শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। অতএব এ মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের সময়ও ডান দিক থেকে শুরু করাই সুন্নাত।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

উম্মে 'আতিইয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর মেয়ে (যায়নাব রাঃ)-কে গোসল করানোর সময় তাদের বলেছিলেন, তোমরা ডান দিক হতে এবং ওযূর অঙ্গ হতে আরম্ভ কর।[৬৮]

৫. পানির পরিমাণ নির্ধারণ করা :

গোসলে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা তা অপচয়ের শামিল। আর অপচয় করা শয়তানের কাজ *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৭)*। হাদীছে এসেছে,

(١) عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক 'ফারাক্ব'[৬৯] পরিমাণ পানির পাত্রে জানাবাতের গোসল করতেন। অন্য

---

৬১. মিরকাতুল মাফতীহ শারহ মিশকাতুল মাফাতীহ ২/১২৩ পৃঃ।
৬২. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬৪।
৬৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।
৬৪. ছহীহ বুখারী ১/৩৯ পৃঃ, হা/২৪৮; নাসাঈ ১/৪৭ পৃঃ, হা/৪২০; তিরমিযী ১/১৭৫ পৃঃ, হা/১০৪।
৬৫. আবুদাঊদ, নাসাঈ ১/৪৬ পৃঃ, হা/৪০৬; মিশকাত হা/৪৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১১, ২/৯৮ পৃঃ। হাদীছ হাসান।
৬৬. ছহীহ বুখারী ১/৪২ ও ৫২ পৃঃ, হা/২৮০ ও ৩৫৭; ছহীহ মুসলিম ১/১৫৩, হা/৭৯০,১৭০২,৫৬৪৭; নাসাঈ ১/২৬-২৭ পৃঃ, হা/২২৫-২২৬; ইবনু মাজাহ ১/৪৫ পৃঃ, হা/৬১৩-৬১৫।
৬৭. ছহীহ মুসলিম ১/১১৮, হা/৬৮।
৬৮. ছহীহ বুখারী ১/২৮-২৯ পৃঃ, হা/১৬৭, ১২৫৫ 'ওযু ও গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা' এবং 'মৃতু ব্যক্তির (গোসল) ডান দিক হতে আরম্ভ করা' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ ১/৪৭ পৃঃ, হা/১১২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২২৭।

বর্ণনায় আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক পাত্রে গোসল করতাম তাতে এক ফারাক্ব পরিমাণ পানি ধরত'।[৭০]

(٢) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِى مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فِى ثَوْبٍ.

২) আবু জা'ফর (রহঃ) বলেন, তিনি এবং তাঁর পিতা জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে ছিলেন। সেখানে আরোও কিছু লোক ছিল। তারা তাকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তোমার জন্য এক ছা' পানি যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বলল, এই পরিমাণ পানি আমার জন্য যথেষ্ট নয়। জাবির (রাঃ) বললেন, তোমার চেয়ে অধিক চুল যার মাথায় ছিল এবং তোমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ ছাঃ) তাঁর জন্য এই পরিমাণ যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি এক কাপড়ে আমাদের ইমামতি করেন।[৭১]

মূলতঃ গোসলের জন্য পানির কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। কেননা বিভিন্ন রেওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন গোসলের জন্য পানির পরিমাণ হবে এক ফারাক্ব।[৭২] অপর এক রেওয়াতে আছে, আয়েশা (রাঃ) এক ছা' পানি দিয়ে গোসল করেছেন।[৭৩] অন্য বর্ণনায় ওযূর জন্য এক মাক্কূক এবং গোসলের জন্য পাঁচ মাক্কূক বলে বর্ণিত হয়েছে।[৭৪] অপর বর্ণনায় রয়েছে গোসলের জন্য এক ছা' ও ওযূর জন্য এক মুদ পানি।[৭৫] অন্য বর্ণনায় ওযূর জন্য এক মুদ এবং গোসলের জন্য এক ছা' থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত[৭৬] পানি ব্যবহারে বর্ণনা রয়েছে। উক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে গোসলে পানির পরিমাণ কমবেশী করা যাবে। যেমন আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন,

واعلم أنه ليس الغسل بالصاع أو الفرق للتحديد والتقدير بل كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربما اقتصر على الصاع وربما زاد علي.

'জেনে রাখ! নিশ্চয় গোসলের জন্য পানির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'ছা' ও ফারাক্ব'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছা' বা ফারাক্ব-এ কখনো কম-বেশী করতেন'।[৭৭] তাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ব্যবহার করতে হবে। কোনভাবেই পানির অপচয় করা যাবে না। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।

৬. পবিত্র পানি নির্ধারণ করা :

পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের পানি অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যদিও পানি নিজেই পবিত্র। তাকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।[৭৮] হাদীছে এসেছে,

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে পেশাব করে সেখানে গোসল না করে।[৭৯] কেননা তা প্রবাহিত হয় না। সুতরাং স্থির পানিতে পেশাব করলে সে পানি দিয়ে গোসল যায়েয হবে না। কেননা তা অপবিত্র।

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জুনুবী/অপবিত্র অবস্থায় স্থির পানিতে (পুকুরে) গোসল না করে। তখন কতিপয় লোক জিজ্ঞেস করল, তাহলে কিভাবে তারা গোসল করবে? তিনি বললেন, পানি উঠিয়ে নিয়ে গোসল করবে।[৮০] উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আবদ্ধ পানিতে পেশাব করার কারণে অপবিত্র হওয়ায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেখানে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং গোসলের জন্য পবিত্র পানি নির্ধারণ করা যরূরী।

৭. বস্ত্র পরিহিতাবস্থায় গোসল করা :

গোসল করার সময় বস্ত্র পরিধান করে গোসল করাই উত্তম। এটা লজ্জাশীলতার পরিচয়।[৮১]

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে সে যেন লুঙ্গি পরিধান ব্যতীত গোসল খানায় প্রবেশ না করে।[৮২] উল্লেখ্য যে, নির্জনে অর্থাৎ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত গোসলখানায় বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করা যাবে। তবে না করাই ভাল। এ মর্মে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহুল বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা

---

৬৯. এক ফারাক্ব সমান প্রায় ৭৫০ কেজি। নাসাঈ ১/২৭ পৃঃ, হা/২২৮-এর হাশিয়া দ্রষ্টব্য।

৭০. 'আওনুল মা'বুদ ১/২৭৭-২৭৮ পৃঃ, হা/২৩৭; নাসাঈ ১/২৭ পৃঃ, হা/২২৮; ছহীহ মুসলিম ১/১৪৮ পৃঃ, হা/৭৫২।

৭১. ছহীহ বুখারী ১/৩৯ পৃঃ, হা/ ২৫২; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১/১৯৫ পৃঃ।

৭২. ছহীহ মুসলিম ১/১৪৮ পৃঃ, হা/৭৫২; 'আওনুল মা'বুদ ১/২৭৭-২৭৮ পৃঃ, হা/২৩৭; নাসাঈ ১/২৭ পৃঃ, হা/২২৮।

৭৩. ছহীহ বুখারী ১/৩৯ পৃঃ/, হা/২৫১; উলে-খ্য এক 'ছা' সমান আড়াই কেজি পানির সমান। বুলূগুল মারাম হা/৫৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ২৬ পৃঃ।

৭৪. নাসাঈ ১/১১ পৃঃ, হা/২৩০, উলে-খ্য মাক্কুক এক মুদের সমান। সুনানু নাসাঈ হা/২২০-এর হাশিয়া দ্রষ্টব্য, ১/১১ পৃঃ। আর এক মুদ সমান ৬০০ গ্রাম পানিকে বুঝায়। বুলূগুল মারাম হা/৩৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২৩ পৃঃ।

৭৫. ছহীহ বুখারী ১/৩৩ পৃঃ, হা/২০১, 'আওনুল মা'বুদ ১/১১৪ পৃঃ, হা/৯২।

৭৬. ছহীহ বুখারী ১/৩৩ পৃঃ, হা/২০১; বুলূগুল মারাম হা/৫৩।

৭৭. 'আওনুল মা'বুদ ১/১১৫ ও ২৭৮ পৃঃ, হা/৯২ ও ২৩৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭৮. 'আওনুল মা'বুদ ১/৯১ পৃঃ, হা/৬৮; বুলূগুল মারাম হা/২,৭; তিরমিযী ১/৯৫-৯৬ পৃঃ, হা/৬৬।

৭৯. ছহীহ বুখারী ১/৩৭ পৃঃ, হা/ ২৩৯; ছহীহ মুসলিম ১/১৩৮ পৃঃ, হা/৬৮২; তিরমিযী ১/১০০ পৃঃ, হা/৬৮; নাসাঈ ১/৯ পৃঃ, হা/৫৮; 'আওনুল মা'বুদ ১/৯২-৯৩ পৃঃ, হা/৬৯, ৭০।

৮০. ছহীহ মুসলিম ১/১৩৮ পৃঃ, হা/৬৮৪; 'আওনুল মা'বুদ ১/৯৩ পৃঃ, হা/৭০-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮১. ছহীহ বুখারী ১/৪২ পৃঃ।

৮২. নাসাঈ ১/৪৫ পৃঃ, হা/৪০১।

করেছেন যে, 'নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা এবং আড় করে গোসল করা। তবে আড় করে গোসল করাই উত্তম'। তিনি এই অনুচ্ছেদে দলীল হিসাবে মূসা (আঃ) ও আইয়ূব (আঃ)-এর দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনা দু'টি নিম্নরূপ :

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে গোসল করত, তখন তারা একে অপরের দিকে দৃষ্টিপাত করত। কিন্তু মূসা (আঃ) সর্বদা একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলত, মূসা (আঃ)-এর কোষবৃদ্ধি (অণ্ডকোষ জনিত এক প্রকার রোগ) রোগের কারণে আমাদের সাথে গোসল করে না। একবার মূসা (আঃ) পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। অতঃপর পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে ছুটতে লাগল। মূসা (আঃ) 'হে পাথর! আমার কাপড়', 'হে পাথর! আমার কাপড়', বলে পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন। এমতাবস্থায় বনী ইসরাঈলরা মূসা (আঃ)-এর দিকে তাকালো। অতঃপর তারা বলল, আল্লাহ্র কৃসম মূসা (আঃ)-এর কোন রোগ নেই। মূসা (আঃ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং প্রহার করতে লাগলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কৃসম পাথরটিতে ছয়টি অথবা সাতটি প্রহারের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল'।[৮৩]

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এক সময় আইয়ূব (আঃ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ূব (আঃ) তাঁর কাপড়ে তা কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। অতঃপর তাঁর প্রভু তাকে ডেকে বললেন, 'হে আইয়ূব! আমি কী তোমাকে এগুলো থেকে মুখাপেক্ষিহীন করেনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ; আপনার সম্মানের কৃসম। কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে মুখাপেক্ষিহীন নই'।[৮৪] উক্ত ঘটনা দু'টি উল্লেখ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমাণ করেন যে, নির্জনে বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করা যাবে। তবে না করাই ভাল।

৮. গোসলের পরে নয় বরং পূর্বে ওযূ করা :

গোসলের পূর্বে ওযূ করলে গোসলের পর পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই। কেননা অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী গোসলের পূর্বে ওযূ করাই যথেষ্ট।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাবাতের গোসলের পর ফযরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর ফযরের ছালাত আদায় করতেন। অথচ আমি (আয়েশা রাঃ) ধারণা করিনি যে, তিনি গোসলের পরে আবার নতুনভাবে ওযূ করেছেন।[৮৫] উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন,

فالوضوء قبل إتمام الغسل سنة ثابتة عنه وأما الوضوء بعد الفراغ من الغسل فلم يحفظ عنه صلى الله عليه و سلم ولم يثبت.

'পূর্ণভাবে গোসল করার পূর্বে ওযূ করা সুন্নাত। গোসলের পর ওযূ করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে প্রমাণিত নয়। সুতরাং হাদীছটি দ্বারা গোসলের পর ওযূ করা সাব্যস্ত হয় না'।[৮৬]

৯. গোসলের পদ্ধতি :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ وفي رواية لمسلم يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يدخلهما الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন এইভাবে আরম্ভ করতেন, প্রথমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন অতঃপর ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। অতঃপর প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢেলে চুলের গোড়ায় খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌঁছতেন। তারপর সারা শরীরে পানি ঢালতেন।[৮৭] মুসলিমের অন্য রেওয়াতে রয়েছে, 'গোসল আরম্ভ করতেন এইভাবে পানিতে দু'হাত ডুবানোর পূর্বে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন। অতঃপর ডানহাত দ্বারা বামহাতে পানি ঢালতেন এবং তা দ্বারা নাপাকী ছাপ করতেন, অতঃপর ওযূ করতেন'।[৮৮] উপরিউক্ত হাদীছে গোসলের পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে। যেমন- প্রথমে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধুবে ও পরে নাপাকী ছাপ করবে। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। তারপর প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢেলে চুলের গোড়ায় খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌঁছবে। অতঃপর সারা দেহে পানি ঢালবে ও গোসল সম্পন্ন করবে।

১০. গোসল শেষে আল-হামদুলিল্লাহ বলা :

গোসলের যাবতীয় কার্যক্রম পরিসমাপ্তির পর আল-হামদুলিল্লাহ বলে গোসল সমাপ্ত করা সুন্নাত। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) গোসলসহ প্রত্যেক শুভ কাজের পরে তাঁর ছাহাবীদের আল-হামদুলিল্লাহ বলার নির্দেশ দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বান্দা খাদ্য খেয়ে অথবা পানি পান করে আল-হামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ খুশি হন।[৮৯] সুতরাং প্রত্যেকের উচিত গোসলের পরে আল-হামদুলিল্লাহ বলা।

তায়াম্মুমের শিষ্টাচার

তায়াম্মুমের সংজ্ঞা : তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ) অর্থ 'সংকল্প করা'। পরিভাষায় ছালাত ও অন্যান্য ইবাদত সমূহ সম্পাদনের জন্য পানির অবর্তমানে ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে মুখমণ্ডল ও দু'হাত (কব্জি পর্যন্ত) পবিত্র মাটি দ্বারা মাসাহ করার ইসলামী পদ্ধতিকে 'তায়াম্মুম' বলে। জেনে রাখা ভাল যে, এই তায়াম্মুম পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সাব্যস্ত। আর এটি উম্মতের উপর আল্লাহ্র পক্ষে থেকে এক বিশেষ রহমত স্বরূপ।[৯০]

---

৮৩. ছহীহ বুখারী ১/৪২ পৃঃ, হা/২৭৮।
৮৪. ছহীহ বুখারী ১/৪২পৃঃ, হা/২৭৯।
৮৫. আবুদাঊদ ১/৩৩ পৃঃ, হা/২৫০; নাসাঈ ১/৪৮ পৃঃ, হা/৪৩০।
৮৬. 'আওনুল মা'বুদ ১/২৯২ পৃঃ, হা/২৪৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব।
৮৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৯,২/৯৩-৯৪ পৃঃ।
৮৮. প্রাগুপ্ত।
৮৯. তিরমিযী হা/১৮১৬; আহমাদ হা/১১৫৬২।
৯০. 'আওনুল মা'বুদ ১/৩৪৯ পৃঃ, অনুচ্ছেদ-১২২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। যা ইতিপূর্বে কোন উম্মতকে দেওয়া হয়নি (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬৬।

১. নিয়ত করা :

পবিত্রতা অর্জনের পূর্বে পানি না থাকলে বা পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুমের নিয়ত করতে হবে। কারণ মানুষের সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[৯১]

২. পানি না থাকলে তায়াম্মুম করা :

প্রয়োজনের সময় পানি না পাওয়া গেলে অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোন অপ্রতিরোধ্য কারণে যেমন পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়া ও জুনুবী অবস্থায় পানির উপস্থিতি না থাকলে তায়াম্মুম করা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.

'যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা সফরে থাক অথবা পায়খানা থেকে আস কিংবা স্ত্রী সহবাস করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা 'তায়াম্মুম' কর ও তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর...' *(মায়েদা ৫/৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَرْحَمُكِ اللَّهُ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসায়েদ বিন হুযায়েরের সাথে আরো কয়েকজনকে আয়েশা (রাঃ)-এর হারানো হার অনুসন্ধান করার জন্য পাঠালেন। এমতাবস্থায় ছালাতের সময় উপস্থিত হওয়ায় (পানি না থাকার কারণে) তারা ওযূ ছাড়াই ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর তারা এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। (ইবনু নুফাইল কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন) উসায়েদ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বদলা দেন। যখনই আপনি কোন সমস্যায় পড়েছেন তখনই আল্লাহ আপনার জন্য সমাধান বের করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহ্র জন্য বরকত রেখেছেন।[৯২]

৩. পবিত্র মাটি নির্ধারণ করা :

তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মাটি পবিত্র হওয়া যরূরী। কেননা অপবিত্র কোন বস্তু কাউকে পবিত্র করতে পারে না।

(١) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ.

(১) আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় মাটি পবিত্র। যদি দশ বছরও পানির দুষ্প্রাপ্য দেখা দেয়, তবুও মুসলিমের ওযূর জন্য পবিত্র মাটি যথেষ্ট। অতঃপর যখনই পানি পাবে তখনই সে যেন গোসল করে। আর এটাই সর্বোত্তম।[৯৩]

(٢) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

(২) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সমগ্র মানব জাতির উপর আমাদেরকে তিনটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের সারিগুলোকে ফেরেশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে। সমস্ত ভূমণ্ডলকে আমাদের জন্য মসজিদ স্বরূপ করা হয়েছে এবং এর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র করা হয়েছে, যখন আমরা পানি না পায়।[৯৪] উল্লেখ্য, ভূ-পৃষ্ঠের মাটি, বালি বা পাথুরে মাটি ইত্যাদি দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। তবে ধুলা-মাটিহীন স্বচ্ছ পাথর, কাঠ, কয়লা, লোহা, মোজাইক, প্লাস্টার, চুন, টাইলস ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে না।[৯৫]

৪. মুক্বীম ও মুসাফির অবস্থায় তায়াম্মুম করা :

প্রয়োজনবোধে মুক্বীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই তা করেছেন।

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

আব্দুর রহমান ইবনু হুরমুয (রহঃ) উমায়েরকে বলতে শুনেছেন যে, আমি (উমায়ের) এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী মায়মুনার আযাদকৃত গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াছার সহ জুহাইম ইবনু হারেছ ইবনু সিম্মাতিল আনছারী (রাঃ)-এর নিকটে যাই। অতঃপর জুহাইম (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (মদীনায় অবস্থিত) জামাল নামের কূপের দিক থেকে আগমন করেন। তখন তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হওয়ায় সে সালাম দেয়। কিন্তু তিনি সালামের জবাব না দিয়ে দেয়ালে হাত মেরে তাঁর মুখমণ্ডল ও দু'হাত (কব্জি পর্যন্ত) মাসাহ করেন। অতঃপর সালামের জবাব দেন।[৯৬] উল্লেখ্য, সফরের অবস্থায় পানির অভাবে তায়াম্মুম করা যাবে। আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন,

وفي إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب وأنه يقوم مقام الماء وإن لم يجد الماء عشر سنين ولا يقتصر الحكم في السفر فقط لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخصه موضعا دون موضع في جواز التيمم بل أطلق.

'পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন তথা তায়াম্মুম করা মুসলিমদের জন্য সফর ও মুক্বীম অবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য। আর তা পানির স্থলাভিষিক্ত। যদিও দশ বছর পানি না পাওয়া যায়। সুতরাং তায়াম্মুমের হুকুমকে শুধু সফরের অবস্থায় সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) তায়াম্মুম যায়েয করার

৯১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।
৯২. ছহীহ বুখারী ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩৪; ছহীহ মুসলিম হা/৮৪৩; আবুদাঊদ ১/৪৫ পৃঃ, হা/৩১৭।
৯৩. তিরমিযী ১/২১১-২১২ পৃঃ, হা/১২৪; আবুদাঊদ ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩২; মুসনাদে আহমাদ হা/২১৯৭৯; মিশকাত হা/৫৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৫, ২/১৩৬ পৃঃ। হাদীছ ছহীহ।
৯৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯১, ২/১৩৪ পৃঃ।
৯৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬৭।
৯৬. ছহীহ বুখারী ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩৫; ছহীহ মুসলিম হা/৮৪৮; আবুদাঊদ ১/৪৭ পৃঃ, হা/৩২৯ 'মুক্বীম অবস্থায় তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ৪৯৮, ২/১৩৮-১৩৯ পৃঃ।

জন্য কোন বিশেষ অবস্থা/স্থানকে নির্দিষ্ট করেননি। বরং তা অনির্দিষ্ট বা সাধারণ।[৯৭]

৫. প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নাপাকি হলে তায়াম্মুম করা :

ইসলাম একটি মধ্যমপন্থা জীবন বিধান। ইসলামী শরী'আত মানুষের প্রতি জবরদস্তিমূলক কোন বিধানকে চাপিয়ে দেয় না। বরং মানুষের পক্ষে যা সম্ভব কেবলমাত্র সেগুলোই পালন করবে। আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 'আমরা তোমাদেকে মধ্যমপন্থা উম্মত বানিয়েছি মানুষের উপর সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূলকে তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরুপ বানিয়েছি' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। তিনি আরো বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সক্ষমতার বাইরে কাজ চাপিয়ে দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। সুতরাং তীব্র ঠাণ্ডায় জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকলে নাপাক্বী ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِى لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى مَنَعَنِى مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّى سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) বলেন, যাতু সালা-সিলের যুদ্ধের সময় তীব্র শীতের রাত্রে আমি নাপাক্বী হই। তখন আশংকা করলাম, যদি আমি এই অবস্থায় গোসল করি তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ হব। তাই তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফযরের ছালাত আদায় করলাম। আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই সংবাদ দিলে তিনি বললেন, তুমি কী নাপাক্বী অবস্থায় তোমার সাথীদের সাথে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি তাঁকে গোসল থেকে বিরত থাকার কারণ জানালাম এবং বললাম, আমি শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের নফসকে হত্যা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু' *(নিসা ৪/২৯)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু না বলে মুচকি হাসলেন।[৯৮]

৬. অসুস্থতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা :

অসুস্থতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা জীবননাশের আশংকা থাকলে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা যাবে।[৯৯] হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالَ.

'আত্বা ইবনু আবু রাবাহ (রহঃ)-এর হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি আহত হয়। ঐ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর সে গোসল কররে তার মৃত্যু হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, এরা লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন এদের ধ্বংস করেন! অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞেস করা নয় কী?[১০০] উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অসুস্থ ব্যক্তি তার জীবনের কোন ক্ষতি বা মৃত্যুর আশংকা করলে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করতে পারবে।[১০১]

৬. তায়াম্মুমের পদ্ধতি :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে যেহেতু তায়াম্মুমের বিধান সাব্যস্ত, সেহেতু সেখানেই তায়াম্মুমের সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। হাদীছে এসেছে,

(١) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِى ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

(১) আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে মাটিতে একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার[১০২] মাসাহ করার নির্দেশ দেন।[১০৩]

(٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِى سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(২) সাঈদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-এর নিকটে এসে জানতে চাইল, একবার আমি অপবিত্র হয়; কিন্তু গোসল করার জন্য পানি পেলাম না। অতঃপর আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনার কী সেই ঘটনা মনে আছে যে, একদা আমরা দু'জনে সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু আপনি তো ছালাত আদায় করেননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। অতঃপর ছালাত আদায় করলাম। তারপর ঘটনাটি আমি নাবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি মাটিতে দু'হাত মারলেন এবং ফুক দিলেন। অতঃপর দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন।[১০৪] উল্লেখ্য যে, মুখমণ্ডল ও হাতের জন্য পৃথকভাবে মাটিতে হাত মারা সম্পর্কে মুখতাসারুল কুদূরীতে একটি বর্ণনা এসেছে,[১০৫] যা সঠিক নয়। কেননা তা সরাসরি ছহীহ হাদীছের বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। সুতরাং ইহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। *(চলবে)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি]

---

৯৭. 'আওনুল মা'বুদ ১/৩৬৪ পৃঃ, হা/৩২৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৯৮. আবুদাঊদ ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩৪; ছহীহ বুখারী ১/৪৯ পৃঃ ।
৯৯. আবুদাঊদ ১/৪৯ পৃঃ, হা/৩৩৬।
১০০. আবুদাঊদ ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩৭।
১০১. قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً-আবুল হাসান ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শারহ মিশকাতুল মাছাবীহ (বানারাস : জামা'আতুস সালাফিইয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৪ হিঃ ১৯৮৪ খ্রিঃ) ২/২৩১ পৃঃ।
১০২. ছহীহ বুখারী ১/৫০ পৃঃ, হা/৩৪৫।
১০৩. আবুদাঊদ ১/৪৭ পৃঃ, হা/৩২৭।
১০৪. ছহীহ বুখারী ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩৮; আবুদাঊদ ১/৪৭ পৃঃ, হা/৩২২।
১০৫. মাওলানা নূর মুহাম্মদ খান ও মাওলানা মোহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুখতাসারুল কুদুরী ও উসূলুশ শাশী আরবী-বাংলা (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা আগস্ট ২০১০ ইং) ৩৪ পৃঃ।

ত্যাগের মহিমায় চির ভাস্বর ঈদুল আযহা : আমাদের করণীয়

-আব্দুল্লাহ

প্রাক কথা :

ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ঈদুল আযহা। মক্কা নগরীর বিরাণ জনমানবহীন মরু প্রান্তরে আল্লাহ্র দুই আত্মনিবেদিত বান্দা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্র কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তুলনাহীন ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বর্ষপরম্পরায় তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে 'ঈদুল আযহা'। আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের উজ্জ্বল নমুনা কেবল এই কুরবানীতে খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু পশু কুরবানী নয়, মাবন জীবনের যাবতীয় পাপাচার, যুলুম-নির্যাতন ও পাশবিকতাকে কুরবানী করা এর মৌলিক লক্ষ্য। পশুর সাথে সাথে নিজেদের পশুবৃত্তিকে কুরবানী দিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টাও এর জ্বলন্ত শিক্ষা। এ কুরবানী নিছক পশু কুরবানী নয়; নিজেদের পশুত্ব, ক্ষুদ্রতা, হীনতা, দীনতা, স্বার্থপরাতা, নীচুতা, আমিত্ব, অহংকার ত্যাগ করে ইবরাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী আত্মত্যাগের প্রেরণার উত্থান ঘটানোর মধ্যে দিয়ে আবারও জাহেলিয়াতের গাঢ় তমিশ্রা ভেদ করে প্রকৃত মানবতার বিজয় নিশান উড্ডিন করা। সমাজে আবার শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা। কুরবানী মানে শুধু গোশত খাওয়ার উৎসব নয়; আল্লাহ্র জন্য নিজের জান ও মালকে সঁপে দেওয়ার নাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি কুরবানীর গোশত-রক্ত চান না, তিনি চান তাক্বওয়া' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। বক্ষমাণ প্রবন্ধে আমরা ঈদুল আযহার গুরুত্ব, ফযীলত, তাৎপর্য, ইতিহাস ও বিবিধ মাসআলা-মাসায়েলের উপর আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কুরবানী কী ও কেন?

কুরবানীকে হাদীছের ভাষায় (أضحية) 'উযহিয়্যাহ' বলা হয়। পরিভাষায় উযহিয়্যাহ হল- ما يذبح يوم النحر علي وجه القربة 'নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানীর দিন যা যবেহ করা হয় তাকেই কুবরানী বলে'।[১০৬] আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, কুরবানীর দিন যবেহকৃত পশুকে উযহিয়্যাহ বলে।[১০৭]

কুরবানী শব্দটি মূলতঃ আরবী (قربان) শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। পরিভাষায় কুরবান বলা হয়, كل ما يتقرب به الي الله تعالي من ذبحة وغيرها 'পশু যবেহ বা অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়া'।[১০৮] যিলহজ্জ মাসের দশম দিনের কুরবানীকে যদিও হাদীছের ভাষায় 'উযহিয়্যাহ' বলা হয়; তথাপি 'কুরবান' শব্দটি 'কুরবানী' অর্থে কুরআন ও হাদীছে একাধিকবার এসেছে। যেমন আল্লাহ্র বাণী, حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ 'যতক্ষণ না আমাদের নিকট এমন কুরবানী আনয়ন না করবে যাকে আগুন গ্রাস করে ফেলে....' *(আলে ইমরান ৩/১৮৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ 'তাদেরকে আদমের দুই ছেলের কাহিনীটি সঠিকভাবে শুনিয়ে দিন। যখন দু'জনে কুরবানী করল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল, অপর জনের হল না...' *(মায়েদা ৫/২৭)*।

শরী'আতের পরিভাষায় কুরবানী হল, 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নামে নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট পশু যবেহ করা।[১০৯]

কুরবানীর গুরুত্ব :

ইসলামী শরী'আতে কুরবানীর গুরুত্ব অপরিসীম। এটা মহান আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। মহান আল্লাহ বলেন, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ 'আর কুরবানীর পশু সমূহকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে' *(হাজ্জ ২২/৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর' *(কাউছার ১০৮/২)*।

কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী ও মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে কুরবানী করত। এর প্রতিবাদ স্বরূপ মুসলিমদেরকে আল্লাহ্র জন্য ছালাত আদায় ও কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে কুরবানী আর্থিক ইবাদত সমূহের মধ্যে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা আল্লাহ্র নামে কুরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক ধরনের জিহাদই বটে।[১১০] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ 'আর আমরা তার (ইসমাঈলের) পরিবর্তে যবেহ করার জন্য দিলাম একটি মহান কুরবানী। আমরা এটাকে পরবর্তীদের জন্য রেখে দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/১০৭-১০৮)*।

তাছাড়া এটি ইসলামের মহান নিদর্শন, যা সুন্নাতে ইবরাহীমী হিসাবে রাসূল (ছাঃ) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন। অতঃপর অবিরত ধারায় মুসলিম উম্মাহর সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি চালু ছিল।[১১১]

হুকুম :

এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও ছুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মতে, তা প্রত্যেক নিছাব পরিমাণ মালের অধিকারীর জন্য ওয়াজিব। ইমাম শাফেঈও একই কথা বলেছেন।[১১২] অন্যদিকে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) কখনো কখনো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করতেন না। যাতে লোকেরা তা আবশ্যক করে না নেয়। যেমনটি তাঁদের প্রতিবেশী আবু সারিয়া বর্ণনা করেছেন।[১১৩]

---

১০৬. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিশকাতুল মাছাবীহ শারহ মিরকাতুল মাফাতীহ (দেওবন্দ : আশরাফী ছাফা, তাবি), ৩/৫০৪ পৃঃ।

১০৭. আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ), তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৭৩ পৃঃ।

১০৮. আল-মুনজিদ ফিল লুগাত ওয়াল 'আলাম (বৈরুত : মাকতাবাতুশ শারফিইয়াহ, তাবি), পৃঃ ৬১৭।

১০৯. আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, পৃঃ ৫৯৪।

১১০. মুফতি মুহাম্মাদ শফী', মারেফুল কুরআন, পৃঃ ১৪৭।

১১১. ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ, ৫/৭১ ও ৭৩ পৃঃ; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বাহ, পৃঃ ৫।

১১২. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/২৮৬ পৃঃ।

১১৩. قَالَ أَبُو سَرِيحَةَ: كُنْتُ جَارًا لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ خَشْيَةَ أَنْ يُقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِمَا –তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/২৮৭ পৃঃ।

কুরবাণীর ফযীলত :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের নেক আমলের চেয়ে অন্য কোন আমল আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় নয়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র পথে জিহাদও কী নয়? তিনি বললেন, না; জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে আর কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি।[১১৪]

যেহেতু কুরবানী ১০ই যিলহজ্জের অন্যতম নেক আমল। তাই এটি উক্ত হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়ায় এটির গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়।

কুরবাণীর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছ সমূহের পর্যালোচনা :

কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত কোন হাদীছই ত্রুটিমুক্ত নয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত প্রায় সব হাদীছই যঈফ ও জাল। যেমনটি ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেছেন।[১১৫]

এক শ্রেণীর আলেম সমাজ ঈদুল আযহার সময় কুরবানী সংক্রান্ত যঈফ ও জাল হাদীছ প্রচার করে থাকে। বক্তা, লেখক, প্রবন্ধকার সমভাবে ঐ জাল ও যঈফ হাদীছ চর্চায় মেতে উঠেন। ঈদের খুৎবা ও অন্যান্য সময়ে শতকরা ৯৫ ভাগ খত্বীব জাল ও যঈফ হাদীছগুলোকে পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করেন। এর প্রধান কারণ তাদের চরম উদাসীনতা ও অজ্ঞতা। অনেকে আবার বলেন, ফযীলতের ক্ষেত্রে জাল ও যঈফ হাদীছ দোষণীয় নয়। বড় বড় মুহাদ্দিছ ও আলেমগণ ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্ণনায় শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। সেখানে আমাদের মত ছোট-খাটো আলেমদের বর্ণনা করতে অসুবিধাটা কোথায়? এর জবাবে বলব, তারা শর্তসাপেক্ষে গ্রহণের কথা বলেছেন। সুতরাং যঈফ হাদীছের ব্যাপারে চূড়ান্ত বক্তব্য হল, কোন ক্ষেত্রই তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা হলাল-হারামের ক্ষেত্রে হোক বা ওয়ায-নছীহত, ফযীলত সহ যেকোন বিষয়ে হোক। সকল মুহাদ্দিছ এ ব্যাপারে একমত যে, যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণা প্রবণ, যার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।[১১৬]

সমাজে প্রচলিত কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الأَضَاحِىُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ.

(১) যায়েদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই কুরবানী কী? তিনি বললেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। তারা জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী ছওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, পশম? তিনি বললেন, পশমের প্রতিটি লোমে একটি করে নেকী রয়েছে।[১১৭]

পর্যালোচনা :

হাদীছটি যঈফ। এ হাদীছের সনদে আবুদাউদ আল-'আমী নামক একজন রাবী রয়েছেন। যার আসল নাম নুফাঈ ইবনুল হারিছ। যাকে মুহাদ্দিছগণ পরিত্যাক্ত (متروك) বলেছেন। ইবনু হাজার বলেন, সে পরিত্যাজ্য । ইবনু মাঈন বলেন, সে মিথ্যুক। আবু হাতিম বলেন, সে হাদীছ বর্ণনায় মুনকার। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, তার সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, সে হাদীছ বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসাঈ বলেন, সে পরিত্যাজ্য।[১১৮] সে হাদীছ জালকারী। ইবনু হিব্বান বলেন, তার থেকে বর্ণনা করা হালাল নয়।[১১৯]

এছাড়া এর সনদে আয়েযুল্লাহ আল-মুজাশিঈ নামক আরেকজন রাবী রয়েছে, সেও দুর্বল। তার সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, সে দুর্বল। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, তার হাদীছ বিশুদ্ধ নয়। আবু হাতিম ও ইবনু হিব্বান বলেন, সে হাদীছ বর্ণনায় মুনকার।[১২০] উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের সনদকে ইমাম হাকিম ছহীহ বলেছেন। যার প্রতিবাদে ইমাম যাহাবী বলেন, আয়েযুল্লাহ আল-মুজাশিঈকে ইমাম হাতিমও মুনকারুল হাদীছ বলেছেন। সর্বোপরি আল্লামা আলবানী (রহঃ)ও এ হাদীছকে জাল বলেছেন।[১২১]

(٢) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا.

(২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কুরবানীর দিনে কোন বান্দা কুরবানীর পশুর রক্ত ঝরানোর চেয়ে আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয় কোন আমল নেই। সে ক্বিয়ামত দিবসে উক্ত পশুর শিং, খুর, লোম প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হবে এবং তার রক্ত যমীনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্র নির্ধারিত মর্যাদার স্থানে পতিত হয়। অতএব তোমরা প্রফুল্লচিত্তে কুরবানী কর।[১২২]

পর্যালোচনা :

হাদীছটি দুর্বল। উক্ত হাদীছের সনদে দু'টি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। (১) উক্ত সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু নাফে' নামক একজন রাবী রয়েছেন। যার সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, তার স্মৃতিশক্তি

১১৪. আবুদাউদ হা/২৪৩৮; তিরমিযী হা/৭৫৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৭; মিশকাত হা/১৪৬০, সনদ ছহীহ।

১১৫. আরেযাতুল আহওয়াযী ৬/২৮৮; গৃহীত : মাসিক আত-তাহরীক, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০৭।

১১৬. সূরা ইউনুস ১০/৩৬; হুজুরাত ৪৯/৬; মুসলিম-এর মুকাদ্দামা, বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪।

১১৭. ইবনু মাজাহ, পৃঃ ২২৬, হা/৩১২৭; মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৩০২; মিশকাত হা/১৪৭৬।

১১৮. قال ابن حجر متروك- وقد كذبه ابن معين- قال ابو حاتم منكر الحديث- قال البخاري يتكلمون فيه- قال الترمذي يضعف في الحديث- قال النسائي متروك الحديث.-ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (বৈরূত : দারুল কায়রো, লেবানন ছাপা, ১৯৯৭) ২/৩১১ পৃঃ, রাবী নং-৮০৮৮ টীকা সহ।

১১৯. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ, ২/৮৩ পৃঃ, হা/৫২৭।

১২০. তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৩৭২, রাবী নং-৩৪৪৭ টীকাসহ।

১২১. যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ২/৮৩ পৃঃ, হা/৫২৭।

১২২. ইবনু মাজাহ, ২২৬ পৃঃ, হ/৩১২৬।

দুর্বল। আবু যুর'আ বলেন, তার মধ্যে সমস্যা নেই। আবু হাতিম বলেন, সে প্রবল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন নয়। যদিও ইবনু হিব্বান সহ অনেকেই তাকে ثقة বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৩]

(২) এছাড়া উক্ত সনদে আবুল মুছান্না নামে জনৈক রাবী রয়েছেন, যার আসল নাম সুলায়মান ইবনু ইয়াযিদ আল-খুযাঈ। তার ব্যাপারে ইবনু হাজারের বক্তব্য হল সে দুর্বল। আবু হাতিম বলেন, সে হাদীছ বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হিব্বান বলেন, তার থেকে বর্ণনা করা ও দলীল গ্রহণ করা কোনটিই বৈধ নয়।[১২৪]

আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটিকে যদিও ইমাম তিরমিযী হাসান এবং ইমাম হাতিম ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন, তবুও এর সনদ ছহীহ নয়। যেমন হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন, সুলায়মান ইবনু ইয়াযিদ দুর্বল। কেউ কেউ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। আল্লামা বাগাবীও হাদীছটির শেষে বলেছেন, তাকে আবু হাতিম নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।[১২৫] উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের অনুরূপ একটি হাদীছ মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাকে (হা/৮১৬৭) বর্ণিত হয়েছে। যার সনদেও আবু সাঈদ শামী নামক একজন পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে।[১২৬]

(٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ عِمْرَانُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً فَأَهَلَّ ذَاكَ أَنْتُمْ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.

(৩) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হে ফাতিমা! তোমার কুরবানীর নিকটে যাও এবং তা অবলোকন কর। কারণ তুমি যে সব গুনাহ করেছ তার রক্তের প্রথম ফোঁটা নির্গত হওয়ার সময়েই তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর বল, 'আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য, যার কোন শরীক নেই, এ জন্যই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি মুসলিমদের দলভুক্ত'। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটি আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য খাছ, না-কি সকল মুসলিমের জন্য? তিনি বললেন, না। সকল মুসলিমের জন্য।[১২৭]

পর্যালোচনা :

হাদীছটি মুনকার। এর সনদে নাযর ইবনু ইসমাঈল আল-বাজালী নামক একজন রাবী রয়েছেন। যার সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, সে শক্তিশালী নয়। ইবনু মাঈন বলেন, সে কিছুই না। ইমাম নাসাঈ বলেন, সে শক্তিশালী নয়।[১২৮] উক্ত সনদে আবু হামযা নামক আরেকজন রাবী রয়েছেন, যার আসল নাম ছাবিত ইবনু আবি সুফিয়া। তার ব্যাপারে ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সে দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, সে দুর্বল, কিছুই না।[১২৯]

আলবানী (রহঃ) বলেন, যদিও হাকিম তার একটি শাহেদ হাদীছ আবু সাঈদ খুদরী থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, এর সনদ ছহীহ। কিন্তু ইমাম যাহাবী এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, উক্ত হাদীছের সনদে আবু হামযা রয়েছে সে খুবই দুর্বল। আর ইবনু ইসমাঈল সেরূপ নয়। তাছাড়া আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত হাদীছেও আতাহিয়্যাহ নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন। এ ছাড়া ইবনু আবী হাতিম তার 'আল-ইলাল' (২/৩৮-৩৯) গ্রন্থে বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, উক্ত হাদীছ মুনকার।[১৩০]

(٤) عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا لِأُضْحِيَّتِهِ كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

(৪) হুসাঈন ইবনু আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর পশুকে খুশী মনে ও নেকীর আশায় যবেহ করবে, উক্ত পশু তার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে।[১৩১]

পর্যালোচনা :

হাদীছটি জাল। উক্ত হাদীছের সনদে সুলায়মান ইবনু আমর আন নাখঈ নামক একজন রাবী আছেন, যিনি মিথ্যুক। আলবানী বলেন, সুলায়মান সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (১/৩৩০) বলেন, তিনি বাহ্যিকভাবে একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তিনি হাদীছ জাল করতেন।[১৩২]

(٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.

(৫) উবাদা ইবনু ছামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাতে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) জাগ্রত থাকবে, সে ব্যক্তির হৃদয় ঐদিন মৃত্যুবরণ করবে না যেদিন অন্য হৃদয়গুলো মৃত্যুবরণ করবে।[১৩৩]

পর্যালোচনা :

হাদীছটি জাল। উক্ত হাদীছের সনদে ওমর ইবনু হারূন নামক রাবী রয়েছেন, তিনি দুর্বল। আলবানী (রহঃ) বলেন, ওমর ইবনু হারূনকে ইবনু মাঈন এবং ছালেহ জাযারাহ মিথ্যুক বলেছেন। ইবনুল জাওযী 'আল-মাওযূ'আত' (২/১৪২) গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। আর ইবনু হিব্বান (২/৯১) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মু'যাল হাদীছ বর্ণনা করতেন; অথচ তিনি তাদেরকে দেখেননি।[১৩৪] আর ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছে বাক্বিয়াহ ইবনু ওয়ালিদ নামক রাবী রয়েছেন, যিনি তাদলীসের

---

১২৩. قال ابن حجر في حفظه لين- قال ابو زرعة لا بأمن به- قال ابو حاتم لين بالحافظ- وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي ثقة. -তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৪২৭ পৃঃ, রাবী নং-৪০৫৭।

১২৪. قال ابن حجر ضعيف من السادسة- وقال ابو حاتم منكر الحديث ليس بقوي- قال ابن حبان ابو المثني شيخ يخالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه. -তাক্বরীবুত তাহযীব ২/৪৫৩ পৃঃ, বাবী/৯৯৫৫।

১২৫. যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ২/৮২ পৃঃ।

১২৬. ফিক্বহুল উযহিয়্যাহ, পৃঃ ১৯।

১২৭. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/১৭; মুসনাদে বাযাযার ২/৫৯; আত-তারগীব ২/১০২; হাকেম ৪/২২২, হা/৭৫২৪। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) সূত্রে শব্দের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ২/৮৩, হা/৫২৮।

১২৮. তাক্বরীবুত তাহযীব ২/৩০৫, রাবী নং-৮০৩০।

১২৯. قال احمد بن حنبل ضعيف ليس بشيء- قال ابن معين ليس بشيء-قال ابو زرعة لين- قال ابو حاتم لين الحديث- يكتب حديثه ولا يحتج به- قال الجرزاني واهي الحديث- قال النسائي ليس بثقة-قال الدراقطني متروك. -তাক্বরীবুত তাহযীব ১/১২১, রাবী নং-৯১৪।

১৩০. যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ২/৮৪।

১৩১. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর ৩/৮৪, হা/২৭৩৬।

১৩২. যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ২/৮৪, হা/৫২৯।

১৩৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২০; ইবনু মাজাহ, পৃঃ ১২৭, হা/১৭৮২।

১৩৪. যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ২/৭৯।

দোষে দুষ্ট। হাফিয ইরাক্বী বলেন, সে মিথ্যাবাদীদের নিকট থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করত।[১৩৫]

(٦) عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ.

(৬) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হে জনগণ! তোমরা কুরবানী কর এবং তার রক্তকে ছওয়াব লাভের মাধ্যম মনে কর। নিশ্চয় এর রক্ত যমীনে পতিত হলে তা আল্লাহ্র হেফাযতে চলে যায়।[১৩৬]

পর্যালোচনা :

হাদীছটি জাল। আলবানী (রহঃ) হায়ছামী (রহঃ)-এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, এ হাদীছের সনদে আমর ইবনু হুসাইন আল-উফায়লী রয়েছেন, তিনি পরিত্যক্ত রাবী।[১৩৭] যার সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন, সে পরিত্যাজ্য। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, সে পরিত্যক্ত। ইবনু আদী বলেন, সে মুযলিমুল হাদীছ।[১৩৮]

(٧) عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.

(৭) হানাশ (রহঃ) বলেন, একদা আমি আলী (রাঃ)-কে দু'টি দুম্বা কুরবানী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এমনটা কেন? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অছিয়ত করেছেন যে, আমি যেন তার পক্ষ থেকে কুরবানী করি। তাই আমি তার পক্ষ থেকে কুরবানী করছি।[১৩৯]

পর্যালোচনা :

হাদীছটি যঈফ।[১৪০] উক্ত হাদীছের সনদে শারিক ইবনু আব্দিল্লাহ আন-নাখঈ আল-কাযী নামক রাবী রয়েছেন, যার স্মৃতিশক্তি দুর্বল থাকায় অগ্রহণযোগ্য। ইবনু হাজার বলেন, তিনি সত্যবাদী; কিন্তু অধিক পরিমাণে ভুল করেছেন।[১৪১]

ইমাম যাহাবী তাঁর 'আয-যু'আফা' গ্রন্থে বলেন, কাত্তান বলেছেন, তিনি সংমিশ্রণে অভ্যস্ত। আবু হাতিম বলেন, তার বহু ভুল আছে। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, সে হাদীছ বর্ণনায় শক্তিশালী নয়।[১৪২]

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত পর্যালোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত বর্ণিত অধিকাংশ হাদীছ জাল এবং যঈফ, যা আমাদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে। অতএব এগুলো প্রচার করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

১৩৫. যঈফ ইবনু মাজাহ, পৃঃ ১৪৬, হা/৩৫৩।
১৩৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩০; ত্বাবারাণী-মু'জামুল ওয়াসিত্ব হা/৮৩১৯।
১৩৭. যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ২/৮৫।
১৩৮. قال ابن حجر متروك- قال ابو زرعة ليس هو في موضع من يحدث عنه- قال ابن عدي حدث عن غير الثقات بغيرها حديث منكر وهو مظلم الحديث- قال الدرائطني متروك.-তাক্বরীবুত তাহযীব ২/৭৪, রাবী নং-৫৬৩৭।
১৩৯. আবুদাঊদ ৩/২২৭ পৃঃ, হা/২৭৯০; তিরমিযী ৪/৭১ পৃঃ, হা/১৪৯৫; মুসনাদে আহমাদ হা/১২৮৫; মিশকাত হা/১৬৪২।
১৪০. যঈফ আবুদাঊদ হ/২৭৯০; যঈফ তিরমিযী হ/১৪৯৫; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬৪২।
১৪১. তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৩৩৭, রাবী নং-৩০৮৪।
১৪২. আলবানী, তাহক্বীক মিশকাত হা/১৬৪২-এর টীকা দ্রঃ; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭৯০, যঈফ তিরমিযী হা/২৫৫, যঈফ ইবনু মাজাহ, পৃঃ ১৬-এর টীকা দ্রঃ।

কুরবানীর ইতিকথা :

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সব শরী'আতে কুরবানীর বিধান জারী ছিল। ছিল ইবাদতের অপরিহার্য অংশ। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ- 'আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্র দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও' *(হজ্জ ২২/৩৪)*। পূর্বের সকল উম্মতের উপর আল্লাহ্র নামে কুরবানীর বিধান চালু ছিল।[১৪৩] তবে তার ধরণ ও প্রকৃতি পৃথক ছিল।

আদম (আঃ)-এর দু'পুত্র হাবিল ও কাবিলের কুরবানীর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম কুরবানীর সূচনা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ 'আপনি তাদেরকে আদমের দু'পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কিছু কুরবানী করেছিল; তখন তাদের একজনের কুরবানী গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি' *(মায়েদা ৫/২৭)*। আদম (আঃ)-এর ঐ পুত্রদ্বয়ের কুরবানীর ঘটনা বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদ সহ বর্ণিত হয়েছে।[১৪৪] উল্লেখ্য যে, এ আয়াতে بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনরূপ মিথ্যা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ চলবে না এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হওয়াও চলবে না।[১৪৫]

এছাড়া তৎকালীন জাহেলিয়াতের যুগেও আরবে এক প্রকার কুরবানীর প্রথা প্রচলন ছিল। তবে তার ধরণ ছিল ভিন্নরূপ। তারা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের অসীলা হিসাবে তাদের মূর্তির নামে কুরবানী করত। অতঃপর তার গোশতের কিছু অংশ মূর্তিগুলোর মাথায় রাখত এবং তার উপর কিছু রক্ত ছিটিয়ে দিত। কেউবা উক্ত রক্ত কা'বা গৃহের দেয়ালে লেপন করত।[১৪৬] অতঃপর মুসলিম উম্মাহ্র উপর যে কুরবানীর বিধান এসেছে তা ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে।[১৪৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ-فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ- سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

'যখন সে (ইসমাঈল) তাঁর পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন তিনি (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। অতএব বল, তোমার মতামত কি? ছেলে বলল, হে আব্বা! আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা প্রতিপালন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন'। 'অতঃপর যখন

১৪৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/২৮১ পৃঃ।
১৪৪. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মারেফুল কুরআন, পৃঃ ৩২৪।
১৪৫. প্রাগুক্ত।
১৪৬. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/২৮৬ পৃঃ।
১৪৭. নায়লুল আওতার ৬/২২৮ পৃঃ।

পিতা ও পুত্র আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে ফেলল'। 'তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহীম!' 'নিশ্চয় তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ'। 'আমরা এমনিভাবে সৎকর্মশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি'। 'নিশ্চয় এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা'। 'আর আমরা তাঁর পরিবর্তে যবেহ করার জন্য দিলাম একটি মহান কুরবানী এবং আমরা এটিকে (অর্থাৎ কুরবানীর এ প্রথাটিকে) পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম'। 'ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক' *(আছ-ছাফফাত ৩৭/১০২-১০৯)*।

ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথম সন্তান। বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যমত্যে ইসমাঈল ইসহাকের বড় ছিলেন। একথা আহলে কিতাবগণও মনে করে থাকে। এমনকি তাদের কিতাবে লিখিত আছে যে, ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর।[১৪৮] আর ইসহাকের যখন জন্ম হয়, তখন ইবরাহীমের বয়স ৯৯ বছরে পৌঁছেছিল। আর তাদের কিতাবে লেখা আছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-কে তার প্রথম পুত্রকে কুরবানীর হুকুম করা হয়েছিল।[১৪৯]

কিন্তু পরবর্তীতে তারা ইসমাঈল (আঃ)-এর জায়গায় ইসহাকের নাম উল্লেখ করে কূটকৌশল অবলম্বন করেছে। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর যেহেতু আরব, তাই তাদের কিতাব থেকে তাঁর নাম মুছে দিয়েছে। শুধুমাত্র শত্রুতার কারণে।[১৫০]

অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) বড় হলেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে চলাফেরা করতে পারেন। আল্লাহ্র ভাষায়, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ 'অতঃপর যখন সে তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনিত হল'। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইবনু যুবাইর, আতা আল-খুরাসনী, যায়িদ ইবনু আসলাম প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, ইসমাঈল (আঃ) ঐ সময় প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং পিতার ন্যায় চলাফেরা করা ও কাজকর্ম করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন।[১৫১]

উল্লেখ্য যে, সন্তান পাওয়ার পর সে সন্তান কতটুকু নেককার তার যেমন পরীক্ষার দরকার ছিল ঠিক তেমনি সন্তান লাভের পর তিনি আল্লাহ্র ভালবাসায় পূর্বের ন্যায় অবিচল আছেন, না সন্তান পেয়ে পরিবর্তন হয়ে গেছেন তারও পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। ফলে আল্লাহ তাকে স্বপ্নযোগে দেখালেন যে, তিনি স্বহস্তে প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে যবেহ করছেন। ইবরাহীম (আঃ) একই স্বপ্ন পর পর তিন রাত্রি দেখেন, এজন্য প্রথম রাতকে (৮ই যিলহজ্জ) ইয়াউমুত তারবিয়্যাহ (يوم التربية) বা 'স্বপ্ন দেখানোর দিন' বলা হয়। দ্বিতীয় রাতে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি নিশ্চতভাবে বুঝতে পারেন যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ হয়েছে। এজন্য এ দিনটি (৯ই যিলহজ্জ) ইয়াউমু আরাফা (يوم عرفة) বা 'নিশ্চিত হওয়ার দিন' বলা হয়। তৃতীয় দিনের একই স্বপ্ন দেখায় তিনি পুত্রকে কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য এ দিনটিকে (১০ই যিলহজ্জ) ইয়াউমুন নাহার (يوم النحر) বা 'কুরবানীর দিন' বলা হয়।[১৫২]

এ ব্যাপারে তিনি শিশুপুত্র ইসমাঈলের মতামত চান, يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى 'হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী বল'। উবাইদ ইবনু উমাইর বলেন যে, নবীগণের স্বপ্ন অহী। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করেন।[১৫৩] অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানের পরীক্ষার জন্য অথবা হঠাৎ কুরবানীর কথা শুনে সন্তান যেন হতবুদ্ধি হয়ে না পড়েন, এজন্য নিজের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সত্য স্বপ্নের বিষয়টি তাঁর সামনে প্রকাশ করলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান উত্তর দিলেন, يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ 'হে পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন, তা সত্তর করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যধারণকারী হিসাবে পাবেন'। অতঃপর পিতা পুত্র একমত হওয়ার পর ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে মাটিতে শায়িত করলেন। আল্লাহ্র ভাষায়, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ 'যখন তাঁরা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন। তিনি পুত্রকে যবেহ করার সময় চিৎ করে না শুইয়ে উপুড় করে শুইয়েছিলেন, যাতে যবেহ করার সময় তাঁর মুখমণ্ডল দেখতে পাওয়া না যায়। ফলে তাঁর প্রতি স্নেহ ভালবাসা জাগবে না এবং যবেহ করতেও থমকে যেতে হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনু যুবাইর, যাহ্হাক এবং কাতাদা (রহঃ) وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ এর এরূপ অর্থ করেছেন।[১৫৪]

মুসনাদে আহমাদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তান-কে যবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শয়তান সামনে এসে হাযির হল। কিন্তু তিনি শয়তানকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হলেন। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) সহ জামরায়ে আক্বাবায় উপস্থিত হলেন। এখানেও শয়তান সামনে এলে তার দিকে তিনি ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি জামরায়ে উসতার নিকট এসে পুনরায় শয়তানের দিকে ৭টি কংকর ছুড়ে মারেন। অতঃপর আরো সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ছেলেকে মাটিতে শায়িত করলেন। ঐসময় ছেলের গায়ে সাদা রংয়ের জামা ছিল। তিনি পিতাকে জামাটি খুলে দিতে বললেন, যাতে ঐ জামা দ্বারা তাঁর কাফনের ব্যবস্থা হয়। এহেন অবস্থায় পিতা হয়ে পুত্রের দেহ অনাবৃত করা অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে শব্দ ভেসে এলো, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 'হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমি সৎকর্মশীল বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকি'। তখন তিনি পিছনে ফিরে একটি দুম্বা দেখতে পেলেন, যার শিং ছিল বড় বড় এবং দেখতে ছিল অতি সুন্দর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ কারণেই আমরা কুরবানীর জন্য এই প্রকারের দুম্বা পসন্দ করে থাকি।[১৫৫] এরপর ইবরাহীম (আঃ) দুম্বাটি ছেলের ফিদইয়া হিসাবে কুরবারনী করলেন এবং ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বললেন, يَا بُنَيَّ الْيَوْمُ وَهَبْتُ لِيْ 'হে পুত্র! আজই তোমাকে আমার জন্য দান করা হল'।[১৫৬] *[চলবে]*

[লেখক : আরবী বিভাগ, ২য় বর্ষ; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও দাওরায়ে হাদীছ, ২য় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

১৪৮. ইবনু কাছীর, ৪/১৭; বাংলা ১৬/২৩৫ পৃঃ, ড. মুজিবুর রহমান অনুদিত। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১৫৭ পৃঃ।
১৪৯. প্রাগুক্ত।
১৫০. প্রাগুক্ত।
১৫১. তাফসীরে তাবারী ২১/৭২-৭৩।
১৫২. তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৬, মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা, পৃঃ ১০।
১৫৩. তাফসীরে তাবারী ২১/৭৫; তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/১৮ পৃঃ।
১৫৪. তাফসীর ইবনু কাছির ৪/১৮ পৃঃ।
১৫৫. মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৭; আবুদাউদ হা/১৮৮৫; মুল কথা মুসলিমের হা/১২৬৪; ইবনু কাছীর ৪/১৯, সূরা আছ-ছফফাতের ১০৩ নং আয়তের ব্যাখা দ্রঃ।
১৫৬. তাফসীরে কুরুতুবী ১৫/১০৭।

গাযায় রক্তের প্রস্রবণ : মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

'রোম যখন পুড়ছে নীরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছে'
'গাঁজায় যখন রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে,
ওবামা, নেতানিয়াহু তখন আত্মরক্ষার কথা বলছে'।

প্রথম বাক্যটি ছিল ৭০ খৃষ্টাব্দের কিছু কাল পূর্বের। যখন ইহুদী কুচক্রী মহল রোমান সাম্রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজ্য কায়েম করেছিল, তখন রোমানগণ কর্তৃক তারা বিতাড়িত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় উক্তিটি বর্তমানে রক্ত পিপাসু তথাকথিত বিশ্বমোড়লদের, যারা রক্তের অভিলাশে উন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক ও খ্যাপা। এটা কোন পাগলামি নয়; বরং তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ। তাদের ঈর্ষানল একমাত্র মুসলিম। তাই যেকোন অজুহাত দিয়ে তারা মুসলিমদের নিধন করতে চায়। ধ্বংস করতে চায় তাদের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য। পরাশক্তির নামধারী এই অসভ্য বর্বর জাতি ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ সারায়েভোর রেলস্টেশনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই মুসলিমদের হাযার বছরের খেলাফতের পতন তরান্বিত করে মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় আন্ডেট ও উপনিবেশের ভিত্তি তৈরি করেছিল। ওছমানীয় খেলাফতের চূড়ান্ত পতন এবং মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিষ্কণ্টক করতে ইঙ্গ মার্কিন পরাশক্তিকে জার্মান নাৎসিবাদের সাইনবোর্ড সামনে রেখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফল অর্জন করেছিল। বিগত দু'টি মহাযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলিমরা। মুসলিমরা যতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ফিলিস্তীনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করা পশ্চিমাদের জন্য তত সহজ হয়েছে।

অন্যদিকে নাইন ইলেভেন ২০০৩ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী ইরাক আক্রমণ করে। মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তের নামে মুসলিম রাষ্টগুলোকে বিভক্ত করে তাদের শক্তি দুর্বল করে ফেলে। অতঃপর ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত হামলা পরিচালনা করে মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাঈল নামক সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটি। তারা মুসলিমদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছে। তারা খুনি স্টালিনের নব্য অনুসারী। স্টালিন বলত, 'হত্যা সব সমস্যার সমাধান'। There is a man there is a problem. No men no problem. তাই ইহুদী-খ্রীষ্টানরা মনে করে, যেখানেই মুসলিম বাস করে সেখানেই সমস্যা। অতএব কোন মুসলিম থাকবে না; ফলে কোন সমস্যাও হবে না। এই কারণে তারা মুসলিম দেশ, জাতি, ঐতিহ্য, নিদর্শন ও আদর্শ সমূলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে চায়।

ইসরাঈল জাতির পরিচয় :

ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক্ব (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল 'ইসরাঈল'। সে হিসাবে ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধরকে বনু ইসরাঈল (بنو إسرائيل) বলা হয়। ইয়াকূব (আঃ) ও বনু ইসরাঈলদের আদি বাসস্থান ছিল কেন'আন, যা বর্তমান ফিলিস্তীন এলাকায় অবস্থিত। তখনকার সময় ফিলিস্তীন ও সিরিয়া একত্রিতভাবে 'শাম' নামে পরিচিত ছিল। প্রথম ও শেষ নবী ব্যতীত প্রায় সকল নবীরই আবাস্থল ছিল ইরাক ও শাম অঞ্চলে। যার গোটা অঞ্চলকে এখন 'মধ্যপ্রাচ্য' বলা হচ্ছে। ইয়াকূব (আঃ)-এর মোট ১২ জন সন্তান ছিলেন। পরবর্তীতে এই ১২ জন সন্তান হতে ১২টি গোত্রের উদ্ভব হয়। আজকের ইসরাঈল জাতি, নবী ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তান সৃষ্ট ১২টি সম্প্রদায়ের সদস্য। ইতিহাসে যাদেরকে ইহুদী নামে নামকরণ করা হয়েছে।

বনু ইসরাঈলের শঠতা, ধূর্তামি এবং পরিণতি :

বনু ইসরাঈল বা ইহুদী জাতির ইতিহাস শুরু হয় নবীদের সাথে প্রবঞ্চণার মাধ্যমে। তাদের এই প্রতারণা ও ঠকামি শেষ নবী এবং তাঁর উম্মত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। ইউসুফ (আঃ)-এর ১০ কুচক্রী ভাইয়েরা তার পিতার সঙ্গে ছলনার আশ্রয়ে তাকে প্রতারিত করেছিল। এই ইহুদী জাতি এতটাই ধূর্ত ও নিষ্ঠুর, যাদের ইতিহাস পড়লে শরীরের লোমে শিহরণ জাগে। অন্তরটা ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। যেমন-

(১) ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাকে অত্যন্ত জঘন্য ও নির্মমভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি।

(২) বস্তুতঃ ইয়াকূব (আঃ)-এর বারজন পুত্রের বংশধারা থেকেই যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন লক্ষাধিক নবী ও রাসূল। আর এই ইহুদীরা নবীদের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে চুরি, যেনা, পাগল, জাদুকর সহ অসংখ্য নোংরা তোহমত লাগিয়েছে এবং হাযার হাযার নবীকে হত্যা করেছে। ফলে তারা অনেক সময় আল্লাহ কর্তৃক এবং বিভিন্ন শাসক কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে। তারা তাদের হঠকারিতার জন্য তীহ প্রান্তরে ৪০ বছর বন্দিত্ব জীবন যাপন করেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের জন্য আসমানী খাদ্য 'মান্না ও সালওয়া' এবং ১২টি ঝর্ণার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তারা আসমানী খাদ্যের পরিবর্তে যমীনের শস্য ফসলের আবেদন করল। ফলে মূসা (আঃ) সেই জন্য মর্মাহত হলেন। এই বনি ইসরাইল মূসা (আঃ)-কে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিল। এই ইহুদী জাতির মাধ্যমে ইয়াহইয়া (আঃ)-এর শিরচ্ছেদ করা হয়।

(৩) বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী ঈসা (আঃ)-এর জীবনে সংগঠিত ঘটনাবলীকে পূজি করে কুচক্রী ইহুদী পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টানদের চরম ভ্রান্তির ভিতর ফেলে। তারা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম 'ত্রিত্ববাদ'-এর জন্ম দেয়। কুচক্রী ইহুদীরা রোমান সম্রাটকে ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। ফলে রোমান আদালত ঈসা (আঃ)-কে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়।[১৫৭] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেন। ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে নবী বলে স্বীকার করেনি। বরং অত্যন্ত লজ্জাজনক ভাবে তারা তাকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রির জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে *(নাঊযুবিল্লাহ)*।[১৫৮]

---

১৫৭. মাহমূদ ও মুহাম্মাদ সিদ্দিক, ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৯), পৃঃ ১৪৮-৫০।

১৫৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১০), ২/১৮৫।

কুচক্রী ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল না। বরং নাছারাদের উপর অমানবিক নির্যাতন, অত্যাচার শুরু করে। রোমান সরকারের সমর্থন নিয়ে তাদেরকে ধরে ধরে হত্যা করে। তারা চক্রান্ত করে সেন্টপলের মাধ্যমে ঈসা (আঃ)-এর ধর্মকে এবং ধর্ম গ্রন্থকে বিকৃতি করে। ইহুদীরা জেনেশুনে প্রবঞ্চণা করতঃ ঈসা (আঃ)-এর সত্য দ্বীনকে বিকৃতি ও বিধ্বস্ত করে দেয়; তাই কুরআন ইহুদীদেরকে (مغضوب) বা 'অভিশপ্ত' বলে অভিহিত করেছে। নবীদেরকে হত্যা এবং শেষ নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খ্রীষ্টানদেরকে 'পথভ্রষ্ট' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিভাবে যুগ যুগ ধরে ইহুদীরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার পর কেউ কেউ হেদায়াতপ্রাপ্ত হল আবার কেউ আল্লাহদ্রোহী রয়েই গেল। ফলে অভিশপ্ত জাতির প্রতারণা, ধূর্তামির লেজুর হিসাবে থেকেই গেল।

(৪) একদা একদল ইহুদী (সিরিয়ায়) শেষ নবীকে হত্যা করার জন্য ওঁৎ পেতে বসেছিল। রাসূল (ছাঃ) যখন ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ায় আগমন করলেন, তখন ৭জন সশস্ত্র ইহুদী যুবক কাফেলার দিকে ছুটে যান মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মযাজক উপস্থিতি থাকার কারণে তা সম্ভব হয়নি।[১৫৯] ধর্মযাজক রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাকে বালক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সাথে করে দেশে ফিরে যেতে বলেন। আবু তালিব তাই করেন।

(৫) ইহুদীরা বনু আউস ও বনু খাযরাজ গোত্রকে এক অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে 'বূয়াস' এর মত দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংগঠিত করে।

(৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তার বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার করে বেড়াতে থাকে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক দলের সাথে মিলিত হয়ে দিন-রাত মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

(৭) ইহুদীরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর নেতৃত্বে উহুদ যুদ্ধে ৩০০ জন সৈন্য মাঝপথ হতে কেটে পড়ে। মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা শত্রু বাহিনীকে সাহায্য করে। ছাদের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করে বনু নযীর নামক এক ইহুদী গোত্র। শুধু তাই নয় সালাম বিন-মিশকাম নামক এক ইহুদীর স্ত্রী জয়নব বিনতুল হারিস বকরীর গোশতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করার চেষ্টা করে। রাসূল (ছাঃ) ইন্তেকালের পর ইহুদীরা দলে দলে মুসলিমদের ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে। ফলে সংগঠিত হয় রিদ্দার যুদ্ধ।

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল অত্যন্ত ধুরন্দর ইহুদী। ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় মিশরে গিয়ে প্রচার করল আলীই প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের উত্তরাধীকারী; খলীফা ওছমান (রাঃ) অন্যায়ের অধিকারী। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্য কুচক্রী সাবা কূফার মানুষদের খলীফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল। সাবার কারণে বিদ্রোহীরা ৪০ দিন পর্যন্ত ওছমান (রাঃ)-এর বাসগৃহ অবরোধ করে শেষ পর্যন্ত তাকে নির্মমভাবে হত্যা করল।

(৯) অতঃপর আলী (রাঃ) খেলাফতের আসনে সমাসীন হলে সাবায়ীপন্থীরা ভান করে আলী (রাঃ)-এর পক্ষাবলম্বন করে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বংশধরদের প্রতি একান্ত মহব্বত রাখে মর্মে একটি দল গঠন করে।[১৬০] তারা ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার বিচারকে উপলক্ষ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে দুই ভাগে ভাগ করে উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা ঘটায়। যাতে প্রায় দশ হাযার লোক শহীদ হন।

(১০) ইহুদীদের প্ররোচনায় ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ছিফ্ফীনের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই অপ্রীতিকর ও কলঙ্কময় ঘটনার পেছনে ইহুদী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার চক্রান্তই সক্রিয়ভাবে কাজ করছিল। এর মূল কারণ ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার নীল-নকশা ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝি। শুধু তাই নয় আলী (রাঃ)-কে ঊর্ধ্বে তুলতে তুলতে তাঁকেই প্রকৃত নবী বলে তারা প্রচার করতে থাকে। এরাই ইতিহাসে 'শী'আ' নামে পরিচিত। মূলতঃ কুচক্রী ইহুদীদের এটা ছিল মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টের এক শক্তিশালী দুরভিসন্ধি।

প্যালেষ্টাইনে ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমা পরাশক্তির প্রতারণা এবং তার পরিণাম :

প্যালেষ্টাইন মুসলিম, খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের নিকট এক পবিত্র ভূমি। সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের সময়ে প্যালেষ্টাইন তুর্কীদের অধিকারে আসে। এই সময় আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে প্যালেষ্টাইনে আর একটি আন্দোলন শুরু হয়। ইহুদীদের এ আন্দোলন 'জিওনিষ্ট আন্দোলন' (The Zionist Movement) নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তারা ইহুদী নেতা থিয়োডোর হারজালের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তারা দলে দলে প্যালেষ্টাইনে এসে বসতি স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ নিলে মিত্রশক্তি মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালি ঘাঁটি তৈরি করতে চায়। মূলতঃ এটি ছিল আরব জাহানের নেতৃবৃন্দদের জন্য একটি টোপ বিশেষ।

আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিত্র শক্তি সাহায্য করবে। ইংরেজরা ইবনে সঊদকে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য উস্কানি দিল। কিন্তু ইবনে সঊদ বৃটিশ অভিসন্ধি বুঝতে পেরে চুপ থাকলেন। মুনাফিক শরীফ হুসাইন ক্ষমতার লোভে আরব নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেন এবং ইংরেজদের প্ররোচনায় হঠাৎ তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।[১৬১] অন্যদিকে মিত্রশক্তি জিওনিষ্টদের প্যালেষ্টাইনে জাতীয় আরবভূমি স্থাপনে সাহায্য করবে বলে জানায়। ইহুদী ও আরবদের নিকট ব্রিটিশ সরকারের পরস্পর বিরোধী প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে ইংরেজদের সুবিধা হল। আরব সৈন্য নিয়ে ইংরেজরা তুরস্ক আক্রমণ করল এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া অধিকার করল। বিজাতীয় তুর্কীদের তাড়াতে গিয়ে আরবরা প্রতারক ইউরোপিয়দের ডেকে আনল। ইহুদীদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর ইহুদীদের জাতীয় আরবভূমি সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা তৈরি করল এবং তা ঘোষণা করল ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে। যা 'বেলফোর ঘোষণা' (Belfour Declaration) নামে পরিচিত।

ফলে প্যালেষ্টাইনে সমস্যা শুরু হল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্যারিস সম্মেলন' যখন প্যালেষ্টাইন নামক দেশটিকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে 'ম্যান্ডেট' হিসাবে স্থাপন করে, তখন থেকে অসংখ্য ইহুদী দলে দলে আসতে শুরু করে। তাছারা ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের অনেক

১৫৯. ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান, পৃঃ ১৬৪-৬৫।
১৬০. ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান, পৃঃ ১৯৩।
১৬১. মোঃ একরাম উল্লাহ দুলাল, মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস (ঢাকা : কে আলী প্রকাশক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫), পৃঃ ৩২৬।

রাষ্ট্রপ্রধান। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইহুদীদের জাগাতে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'হে ইহুদী! জাগো, এই তো সময়!' শুধু তাই নয় অনেক কবি কবিতা রচনা করে, প্যালেষ্টাইনে আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।

১৯১৭ সালে প্যালেষ্টাইনে মোট জনসংখ্যা ছিল ৭ লাখ। যার শতকরা ৯২ ভাগ আরব ফিলিস্তীন ও শতকরা আট ভাগ ইহুদী। এদিকে বৃটেন এক ইহুদী স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েলকে ফিলিস্তীনে বৃটিশ হাই কমিশনার করে পাঠালো। ফলে ১৯১৮ সালে ছিল ৫৬,০০০ জন ইহুদী। ১৯২৫ সালে হল ১,০৮,০০০ জন, ১৯৩৫ সালে ৩,০০,০০০ জন এবং ১৯৪৮ সালে ৫,৪০,০০০ জন।[১৬২]

বৃটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় দলে দলে ইহুদী আগমন করলে আরব-ইহুদী দাঙ্গা শুর হয়। ১৯২১, ২৯ ও ৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উপরোক্ত দাঙ্গার ফলে অসংখ্য লোক হতাহত হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল কমিশন (Royal commission) নিয়োগ করে। এর মাধ্যমে প্যালেষ্টাইনকে আরব, ইহুদী ও বৃটিশ অধিকৃত জেরুজালেম অঞ্চলে বিভক্ত করার পরিকল্পনা পেশ করে। ফলে আরব-ইহুদী সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তার নিজের নীতি 'হোয়াইট পেপার'-এ ঘোষণা করে। এত বলা হয় যে, দশ বছর পর একটি প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠন করা হবে। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী প্রবেশ সীমাবদ্ধ করা হল। এই সিদ্ধান্ত আরব বিশ্ব মেনে নিলেও ইহুদীরা মেনে নেয়নি। ফলে তারা আমেরিকার সহযোগিতা কামনা করে। ১৯৪২ ও ১৯৪৪ সালে বিশ্ব জিওনিষ্ট সম্মেলন হয়। তারা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে চাপ দেয়। ফলে তিনি প্যালেষ্টাইনে এক লক্ষ ইহুদী অধিবাসী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেন। ফলে ১৯৪৫ সালে আরবলীগ গঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সরকার প্যালেষ্টাইন সমস্যা জাতিসংঘে পেশ করল। জাতিসংঘ একটি বিশেষ কমিটি (Special commitee) নিয়োগ করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্যালেষ্টাইন আরব, ইহুদী ও জেরুজালেম রাষ্ট্রে বিভক্ত হল। ফলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। অতঃপর আরবগণ যখন বিজয়ের পথে, তখন জাতিসংঘ চার সপ্তাহের জন্য যুদ্ধ থামাতে বলে। তাদের কৌশল হল, ইহুদীরা যাতে এই যুদ্ধ বিরতির সময় আমেরিকা ও রাশিয়া হতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে। তারা তাই করল। আমেরিকা উদ্বাস্তু বেশে প্যালেষ্টাইনে সৈন্য পাঠাল। আরবগণ ইহুদীদের সঙ্গে আর পেরে উঠতে পারল না। ফলশ্রুতিতে তারা প্যালেষ্টাইনের একটি অংশ দখল করে ইসরাঈল বা ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং তেলআবিবকে রাষ্ট্রের রাজধানী করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘ মুসলিম জাহানের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ইসরাঈল রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেয়।[১৬৩] ফলে আজ পর্যন্ত পরাশক্তির প্রতারণা, জাতিসংঘের ধূর্তামি ও হঠকারিতার জন্য ইহুদীরা বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে আরব বিশ্বে রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত করল।

ইসরাঈলী বর্বরতা এবং গাযার অবস্থা :

ইহুদী পথভ্রষ্ট জাতির পশুত্বব্যঞ্জক ও নিষ্ঠুর আচরণে গাযা আজ এক মৃতুপুরী। লক্ষ লক্ষ নিরপরাদ মুসলিমকে হত্যা করেও তাদের রক্ত পিপাসা নিবারণ হচ্ছে না। 'অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ' নামে গণহত্যা চালাচ্ছে। স্থলপথে ইসরাঈল সেনা গাযায় ঢুকে ধ্বংসলীলা অব্যাহত রেখেছে। ইসরাঈলী ডিফেন্স ফোর্স হামাসের সুড়ঙ্গ ঘাটিগুলো নির্মূল করার নামে গাযায় প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের হত্যার কৌশল যেন রাজার হাতে পশু শিকারের ন্যায়। একদিকে রাজার বাহিনী জঙ্গল হতে পশু প্রাণীকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে, অন্যদিকে রাজারা তাদের রাজ আসনে বসে জঙ্গলের এক কর্ণারে বন্দুকের নল দ্বারা পশু শিকার করছে। বোমারু বিমান দ্বারা যখন তারা বোমা হামলা করছে মানুষ তখন আশেপাশের এলাকায় বাঁচার জন্য পলায়ন করার চেষ্ট করছে, তখনই হায়েনারূপী ইহুদীরা তাদেরকে স্থল ও সমুদ্র থেকে পশুর মত হত্যা করছে। যুবতী নারীকে পেলে বাঘের মত গর্জন করে তার সতীত্বের সর্বনাশ করে হত্যা করছে। এমনকি গর্ভবতী কোন মহিলাকে তারা ছাড় দিচ্ছে না। ফেরাউনের মত তারা শিশুদের যবেহ করছে। তারা মনে করে 'গাযাবাসী মানুষ নয়'। স্রেফ কিছু প্রাণী, যাদের ব্যাপারে কোন দায় দায়িত্ব নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যম 'সিবিএস'-কে নেতানিয়াহু বলেন, 'দুর্ঘটনায় সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত; কিন্তু এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ দায় হামাসের'।

জ্বলন্ত গাযায় ঝরছে প্রাণ। মরছে নিরীহ নারী-পুরুষ আর নিষ্পাপ শিশু। মায়ের কোলে থাকা শিশুর প্রাণ যাচ্ছে বোমার আঘাতে, বাবার হাত ধরে পথে থাকা শিশুও মরছে একইভাবে। অনেক আদরের ছোট্ট সোনার ছোট্ট শরীরটি কাপড়ে মুড়ে মা তুলে দিচ্ছেন বাবার হাতে দাফন করতে। কিন্তু এই কলিজার টুকরা শিশু সন্তান দাফন করতে গিয়ে বাবাকেও কাফনের কাপড় পরিধান করতে হচ্ছে। হাসপাতালে শিশুদের আহাজারী, বুকফাঁটা আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। অনেকেই হায়তো জানে না তাদের পিতামাতা আর বেঁচে আছে কি-না। তারা বিষাক্ত এই ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে জীবন যুদ্ধের সঙ্গে লড়ছে আর বিশ্বমোড়লরা ইহুদীদের আত্মরক্ষার কথা বলছে।

বিশ্ব মোড়লদের দ্বৈবিধ্য আচরণ এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনে হত্যার উৎসব :

গোটা বিশ্ব যখন ফুটবল উন্মাদনায় উম্মক্ত, মুসলিম বিশ্ব যখন ছিয়ামের আত্মশুদ্ধি অর্জনে ব্যস্ত, ঠিক তখনই নেতানিয়াহু ও বিশ্ব মোড়লরা গাযায় মুসলিম নিধনে ব্যস্ত।

তিন ইসরাঈলী কিশোর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একমাস পর হামাসের উপর দোষারোপ করে ইহুদী সম্প্রদায় গাযার উপর যে বর্বর হামলা করছে তা ইতিহাসে বিরল। ভারী অস্ত্র, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হচ্ছে নিরাপরাধ একটি বেসামরিক জনসমাজ। যাদের কোন শক্তিশালী সেনাবাহিনী নেই, নেই অস্ত্রশস্ত্র, তাদেরই উপর চালানো হচ্ছে পুরাদস্তুর সামরিক আক্রমণ। দানবীয় হত্যালীলার বাস্তবতা এড়িয়ে গিয়ে পশ্চিমা কূটনীতিক মহল এবং বিশ্বমোড়লরা বরাবরের মত নগ্নভাবে ইসরাঈলের পক্ষ নিয়েছে। বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সামরিক হামলা, জাতিসংঘ চার্টার অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইনও নীতিবিরোধী। তারপরও জাতিসংঘ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নীরব; বরং তারা হামাসকে রকেট হামলা বন্ধের পরামর্শ দিচ্ছে আর ইসরাঈলকে কূটনীতি, সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। তারা হামাসকে দায়ী করছে আর ইসরাঈলকে সমর্থন করছে।

হে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা নীরব কেন? বিশ্বমোড়ল নামের হায়েনা পশুরূপী মানুষদের দ্বৈবিধ্য আচরণ আর কতদিন সহ্য করবে? কোথায় বিশ্বশান্তি সংস্থা? কোথায় মানবাধিকার সংস্থা? কোথায় জাতিসংঘ?

১৬২. ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান, পৃঃ ৩০৭।

১৬৩. মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৪১।

অথচ জাতিসংঘ সনদে সকল জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সীমানা সম্পর্কে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে।[১৬৪] কিন্তু স্থায়ী অধিবাসী ফিলিস্তীনিদের হটিয়ে, হত্যা করে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত (জাতিসংঘের মাধ্যমে) ইহুদী রাষ্ট্রের এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে কোন সীমানা নেই। একটি মাত্র রাষ্ট্র, যার সীমানা অনির্ধারিত। তাই সে জেরুযালেম, ফিলিস্তীন, লেবানন ও সিরিয়ার একটি অংশকে যুক্ত করে বৃহত্তর ইসরাঈল রাষ্ট্র গঠন করবে এবং সীমানা ঘোষণা করবে। ৬৫ বছর পেরিয়ে গেলেও এখন তারা সীমান্তের চূড়ান্ত রূপ দেয়নি। এটাকে বলে Green line. তাদের লক্ষ্য হল ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদ, লোহিত সাগরের তীর থেকে তুর্কী সীমান্ত এই আরবী এলাকা, যা এক সময় অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তা দখলে এনে চূড়ান্ত সীমান্ত ঘোষণা করা। এটাই হল জায়নবাদী ইসরাঈলী আধিপত্যবাদ। আর এটাকে জাতিসংঘ এবং পরাশক্তি নামে মোড়লরা সমর্থন দিচ্ছে, আঞ্জাম দিচ্ছে হত্যা করতে সামরিক শক্তির। পাশাপাশি উদ্বিগ্ন আমেরিকা ইসরাঈলের এই নৃশংস হামলাকে বলছে যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত, কেননা তা আত্মরক্ষার জন্য।

সুধী পাঠক! মালয়েশিয়ার বিমান ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে ওবামা সরাসরি রাশিয়াকে দায়ী করল, যার প্রমাণ এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। অথচ ওবামার চোখের সামনে শিশুদের বুকফাঁটা আর্তনাদ, গগণ বিদারী কান্না আর গাযার রক্তের গঙ্গা বইয়ে গেলেও তার পাষাণ হৃদয় কাঁপছে না। বরং ইসরাঈলদের আত্মরক্ষার কথা বলছে, ফিলিস্তীনি আরবদের দোষারোপ করছে। ধিক! ওবামার জাতিসংঘ! ধিক! ইউরোপ!

এদিকে আন্তর্জাতিক সমর্থনে ইসরাঈল পৈশাচিক কায়দায় ফিলিস্তীনি হত্যাকে একটি উৎসব হিসাবে উদযাপন করছে। আল জাজিরার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্ট্রিম-এ এ ধরনের একটি অবিশ্বাস্য ছবি প্রকাশ পেয়েছে। ছবিতে একদল লোককে ইসাঈলের এসডেরট এলাকায় একটি পাহাড়ে দল বেঁধে সন্ধ্যা যাপন করতে দেখা যায়। গরমের সন্ধায় পাহাড়ের উপর হাওয়া খাচ্ছে বলে মনে হবে। প্রকৃত পক্ষে এরা গাযায় ইসরাঈলী বাহিনীর বোমা হামলার দৃশ্য উপভোগ করছে। নিক্ষিপ্ত বোমায় নারী-শিশুর আর্তনাদ সেখানে পৌঁছার কথা নয়, তবে বোমা বিস্ফোরণের ভয়াল গর্জন তারা শুনছে। নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে উল্লাশ করছে।

মুসলিম বিশ্বের মানসিকতা এবং মধ্যপ্রাচ্যের পরিণতি :

মুসলিম নেতৃবৃন্দের মানসিকতার ফল হল আজকে গাযার রক্ত স্রোত। আজ মুসলিম বিশ্বসহ আরব বিশ্ব মুখে কুলুপ দিয়ে মজা দেখছে; বরং প্রকারন্তরে গাযার হত্যালীলা এবং ধ্বংসযজ্ঞকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করছে। মুসলিম প্রধান দেশের নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার প্রতি লোভ এবং মুনাফিকীর কারণে ইসরাইল এরূপ বর্বরতম ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একবাক্যে ইসরাইল এবং পশ্চিমা পরাশক্তিদের যদি হুঙ্কার ছাড়ে তাহলে তারা অবশ্যই এই রক্তের হোলি খেলা বন্ধ করতে বাধ্য। কিন্তু না; অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি ক্ষমতার চেয়ার ছিটকে পরে। বরং তাদের কাছে মুসলিম বন্ধুর চেয়ে আমেরিকা বন্ধু অনেক ভাল। কারণ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারলেই ক্ষমতার চেয়ার সুদৃঢ় থাকবে, অন্যথা নয়। আরব রাষ্ট্রগুলোতে রাজনীতিকদের মধ্যে ইসলাম ভীতি এত বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে যে, তা ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর কার্যক্রম অপসন্দ করার বিষয়টিও পেছনে ঠেলে দিয়েছে।

সঊদী আরব, জর্দান, সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ আরবদেশগুলোর একটি নতুন জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছে মিসর। কিন্তু তাদের উচিত ছিল গাযার প্রতি সমর্থন এবং ইসরাঈলের প্রতিরোধ করা। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। অন্যদিকে ইরান আগে হামাসকে সমর্থন দিলেও এখন সেভাবে দিচ্ছে না। কারণ ইরান সিরিয়ার শী'আপন্থী সরকারকে সমর্থন দেয়। আর হামাস সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বিরোধীদের সমর্থন দিচ্ছে। ইহুদী খ্রীষ্টানদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে মুসলিমরা মুসলিমদের নিধন কাজে ব্যস্ত, সেখানে গাযার মানুষের করুণ আর্তনাদ কী তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছাবে? অথচ ৭১১ খ্রিঃ সিন্ধুর জলদস্যু কর্তৃক আরব জাহাজ লুণ্ঠন হলে মুসলিম নর-নারীর আর্তনাদ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কর্ণকুহরে পৌঁছার সাথে সাথে মুহাম্মাদ বিন কাসেমের নেতৃত্বে সিন্দু রাজা দাহিরের বাহিনীকে পরাজিত করে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতএব হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ! তোমাদের এরকম শৌর্যবীর্য থাকা সত্ত্বেও কিসে তোমাদের বিচ্যুতি ঘটাল? নেতৃত্ব বা ক্ষমতার লোভ তো তোমাদের মধ্যে ছিল না! ক্ষমতার লোভ করতে গিয়ে আজকে মধ্য প্রাচ্যের এই পরিণতি। মুসলিম রাজত্ব ধ্বংস হয়ে অমুসলিমদের রাজত্ব চলছে! যা ওপেন সিক্রেট।

এমনকি অমুসলিমরাও মুসলিম নেতৃবৃন্দের নীরবতার জন্য সামলোচনা করেছেন। বৃটিশ এম.পি, লেখক ও সাংবাদিক জর্জ গ্যালওয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের কড়া সমালোচনা করে বলেন, 'আপনাদের লজ্জা বলতে কী কিছু আছে'? তিনি আরো বলেছেন,

Will any one any arab or Muslim leader stand up and lift even a finger to help the Palestinian people in this massacre? May God damn you. where is Erdogan? The would be oftoman protector ? Where? Where is waleed bin Talal bin abdel Aziz Al-Saud, CO-owner of fox and sky News, where are the kings and Emirs of the arab world? So ready to pay for the murder of Arab where is king Abdullah, `Custodin of Mosques'? Where is General Sisi "The new nesser'? I adress the Arab and Muslim Leader Sincerely with this question. Have you no Sence of Shane? Judge Your selves befor you are Judged....

অর্থাৎ 'কেউ কী নেই, আরব অথবা মুসলিম নেতা? কেউ উঠে দাঁড়াও না এবং তোমার একটি আঙ্গুল হলেও কেন বাঁড়িয়ে দিচ্ছ না গণহত্যার শিকার ফিলিস্তীনিদের জন্য? সৃষ্টিকর্তা তোমাকে ধ্বংস করে দিবে। কোথায় এরদোগান, অটোমানের রক্ষাকর্তা? কোথায় ওয়ালিদ বিন আব্দুল আযীয আল-সঊদ, ফক্স এবং স্কাই নিউজের সহযোগী মালিক? কোথায় আরব জাহানের শাসনকর্তা? আরবদের এই খুনের দায় সবাইকে নিতে হবে। কোথায় দুই মসজিদের সেবক বাদশা আব্দুল্লাহ? কোথায় মিশরের জোনারেল সিসি, নতুন আব্দুল নাছের? শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি আরব এবং মুসলিম নেতাদের কাছে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর চাই। তাদের বলতে চাই, আপনাদের লজ্জা বলে কী কোন অনুভূতি আছে? বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর আগে নিজেকে বিচার করুন'। অতএব, হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ! অমুসিলম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

১৬৪. প্রাগুপ্ত, পৃঃ ১৯৩।

মিড়িয়ার নোংরাভাব এবং বিশ্বসম্প্রদায় :

গাযার হত্যাযজ্ঞ নিয়ে বিশ্ব মিডিয়াতে যে নষ্ট মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা সাবেক মার্কিন সহকারী সেক্রেটারী এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সহযোগী সম্পাদক ড. পল ক্রেইগ রবার্টসের দু'টি নিবন্ধের মাধ্যমে জানা যায়। তিনি তার 'পশ্চিমা বিশ্বের নৈতিকতার ব্যর্থতা ও ইসরাঈলের হত্যাকাণ্ড' এবং 'প্যালেষ্টাইনে চুরি' শিরোনামে লিখেছেন, 'পশ্চিমা রেডিও, টিভি সংবাদ মাধ্যমগুলো এমন, যেখানে শুধু তাদেরই সংবাদ ভয়ানকভাবে প্রচার করা হয়। যেমন- গাযায় ইসরাঈলী আক্রমণের জন্য মূলতঃ গাজাবাসীই দায়ী। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার বিমান ধ্বংসের জন্য রাশিয়া দায়ী। শুধু তাই নয়, ফিলিস্তীন জনগণের বেঁচে থাকার অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে। 'বিবিসি'-এর কয়েকটি ছবি বিশ্লেষণ করলে এই চিত্রই প্রকাশ পায়। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমটিও ইহুদীদের পক্ষপাতপুষ্ট। পৃথিবীর যে সকল সংবাদ সংস্থা থেকে প্রতিটি রাষ্ট্র সংবাদ সংগ্রহ করে তার সবগুলোই ইহুদীদের তৈরি ও নিয়ন্ত্রণে। তাই তারা ইসরাঈল ও ইহুদীদের পক্ষে এবং আরব মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে সুবিধাজনক স্থানে আছে। যেমন, রয়টারস। দুনিয়ার ৯০ ভাগ সংবাদই সংগ্রহ ও সরবরাহ করে এই প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীতে এমন কোন সংবাদ সংস্থা নেই, যারা রয়টারস থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে না। তাছারা AFC (ফ্রান্স নিউজ এজেন্সি), The New york Times, The whshington post, The internationaol Herald tribune, The New york post, Wnited press International (UPI) এবং The Ssociated press (AP) তাছারা তারা প্রায় ২৩০টি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে।[১৬৫]

বিবিসির একটি ছবিতে আট-দশ বছরের একটি ফিলিস্তীনি শিশু রাস্তায় পড়ে চিৎকার করে কাঁদছে। এ শিশুর বাবা বিমান হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। তাকে সান্ত্বান দেওয়ার মত কেউ নেই। এমনকি একটু পরে ইসরাঈলী বিমান হামলায় সে নিজেও যে প্রাণ হারাবে না তারও নিশ্চয়তা নেই। এই ছবির উপর বিবিসি যে ছবিটি পোষ্ট করেছে, তা কন্যা শিশুসহ এক ইসরাঈলী মায়ের। হামাসের নিক্ষিপ্ত কামানের বিস্ফোরণে ভয় পেয়েছে শিশু কন্যাটি। মা তাকে স্থানীয় স্বাস্থকেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন। দু'জন ডাক্তার ও কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী তাদের ঘিরে ধরে আছেন। আদর করে শিশুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন ডাক্তার। এ দু'টি ছবি বিশ্ব মোড়লদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছে। একটি জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে বিশ্বসম্প্রদায়। অন্য গোষ্ঠীর প্রাণ রক্ষার দাবিকেও অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। অন্যান্য ছবিতে একই দৃশ্য। ইসরাঈলী সৈন্যরা উপভোগ করছে বিশ্বকাপ ফাইনাল; একই সময় গাযাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর অশ্রু এবং রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

স্বল্প ক্ষতির দীর্ঘ লড়াই এবং পরাশক্তিদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি :

প্রতিবারের মত এবারের অভিযানে ইসরাঈলের সামরিক উদ্দেশ্য হল, হামাসের ধ্বংস সাধন। এই কথা বলে ইসরাঈল আগেও একাধিকবার গাযায় হামলা করেছে। যেমন ২০০৮, ২০১২ সালের আক্রমণ ইসরাঈল কী চায়? তাদের স্ট্রাটেজি বা কৌশল কী? মধ্যপ্রাচ্যকে উত্তপ্ত রাখা ও ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্য কী? ইসরাঈলের সামরিক ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, তারা এক দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের অংশ হিসাবেই এসব স্বল্প মেয়াদি সংঘাতে লিপ্ত আছে। তাদের যুক্তি হল, এটি হল ইংরেজীতে যাকে বলে 'লং ওয়ার অব অ্যাট্রিশন', যার অর্থ 'স্বল্প ক্ষতির দীর্ঘ লড়াই'। তারা স্বল্প ক্ষতির মাধ্যমে দীর্ঘ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

প্রথম আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, দ্বিতীয়বার আবার যুদ্ধ হয় ১৯৫৬ সালে সুয়েজখাল নিয়ে। এরপর ১৯৬৭ সালে। সর্বশেষ যুদ্ধটি হয় ১৯৭৩ সালে। প্রতিটি যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরাঈলের নিকট পরাজিত হয়েছে এবং একই সাথে বিশাল এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণও হারিয়েছে। ইতিপূর্বে পশ্চিম তীর ছিল জর্ডানের অধীন এবং গাযা উপদ্বীপ ছিল মিসরের মালিকানাধীন। ৬৭ সালে ইসরাঈল এই এলাকাগুলো দখল করে নেয়। তাছাড়া পরাশক্তি তথা ইউরোপ দেশগুলো এই স্বল্প ক্ষতির দীর্ঘ লড়াইয়ের পিছনে অনেক কারণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে, যা তাদের মধ্যপ্রাচ্য নীতির অন্তর্ভুক্ত। তারা ইসরাঈলের মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করতে চায় এবং ইসরাঈলকে পুরোপুরি এই কাজে নিয়োজিত রাখতে চায় সহযোগী হিসাবে। তাদের মৌলিক কারণের মধ্যে অন্যতম হল :

১. মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশকেই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে না দেওয়া।[১৬৬]

২. মধ্যপ্রাচ্যে তেলসম্পদ ও ভূরাজনৈতিক সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানে একটি লাঠিয়াল রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠা করা।

৩. সামরিক স্বৈরাচার ও রাজ পরিবারকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করা এবং কোথাও আঞ্চলিক সামরিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে তা সমূলে ধ্বংস করা। যেমন, গাযায় 'হামাস' ও মিশরে 'মুসলিম ব্রাদার হুড'।

৪. আরবদের হত্যা করা এবং তাদেরকে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের দাসে পরিণত করা।[১৬৭]

৫. ইহুদী হোলোকস্ট[১৬৮] (Holocaust)-এর কাহিনী দ্বারা খ্রীষ্টান হোলোকষ্ট ভুলিয়ে দেওয়া। যেমন ইউরোপে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা চর্চার পরিণতি হিসাবে তাদের নির্যাতন ও হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে আবার সেই ইহুদী নির্যাতন ও হত্যার ঘটনাকেই সাম্রাজ্যবাদ মহীয়ান করতে চায় কেন? তা হল তাদের অতীতের জঘন্য ও ঘৃণ্য অপরাধ লুকিয়ে রাখার মতলব।

সুধী পাঠক! ইউরোপের এই সাদা মানুষগুলো কি আদিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করেনি? জনগোষ্ঠীর পর জনগোষ্ঠীকে কী নিশ্চিহ্ন করেনি? কালোদেরকে কী দড়িতে লটকিয়ে মারেনি? পুড়িয়ে হত্যা করেনি? তাদের ইতিহাস কী আমরা মনে রেখেছি বা জানি? আমেরিকান ইন্ডিয়ান, মায়া, ইনকা, দাস হিসাবে ধরে নিয়ে যাওয়া আমেরিকায় আফ্রিকার কালো মানুষসহ আরো অগণিত মানুষ, যাদের ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদ মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। বর্তমানের হামলাটাও সাদা মানুষদের হোলোকষ্টকে ভুলিয়ে দেওয়ার একটি অংশ। আর হামাস হল এই বর্বর আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য। কেননা হামাসই ফিলিস্তীনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন। হামাস কেন ইসরাঈলের প্রধান শত্রু এবং ইসরাঈলী বর্বরতায় বিশ্ববাসীর নীরবতার কারণ জানতে হলে ফিলিস্তীনি রাজনীতির সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। যেমন,

---

১৬৫. ইসরাইল ও মুসলিম জাহান, পৃঃ ১৩।

১৬৬. নয়া দিগন্ত, শনিবার ৯ আগষ্ট ২০১৪।

১৬৭. নয়া দিগন্ত, শনিবার ৯ ই আগষ্ট ২০১৪।

১৬৮. Holocaust অর্থ আগুনে সম্পূর্ণ ধ্বংস, (বিশেষতঃ মানুষের জীবন) সামগ্রিক হত্যাকাণ্ড বা সম্পূর্ণ বিনাশ।

ফিলিস্তীনের রাজনীতি এবং জনগণ সম্পূর্ণ দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ ফাতাহ, অপরদিকে ইসলামপন্থী হামাস। ফাতার সাথে রয়েছে ইসরাঈল ও পশ্চিমা বিশ্ব। অন্যদিকে হামাস এদের কট্টোর বিরোধী। ফাতাহ ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার জন্য ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করে। অপরদিকে হামাস সংগ্রাম করে ফিলিস্তীনকে স্বাধীন করে। ফাতাহ ইসরাঈলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। অপরদিকে হামাস অস্বীকার করে।

২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারী নির্বাচনের মাধ্যমে হামাস ১৩২টি আসনের মধ্যে ৭৬টি আসনে বিজয়ী হয় এবং সরকার গঠন করে। তারপর থেকে ইসরাঈল, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা আতংকিত হয়ে পড়ে। কারণ তাদের উপরের উদ্দেশ্য হয়তো বাস্তবায়ন হবে না। তাই তারা হামাসকে বয়কট করে। অতঃপর তারা 'প্যালেষ্টাইনিয়ান এন্টিটেররিজম অ্যাক্ট ২০০৬' (২১ ডিসেম্বর) নামের বিল পাস করে ফিলিস্তীনের প্রতি সব ধরনের সাহায্য বন্ধ করে দেয়। বিভিন্ন ইন্ধনে ফাতাহ এবং হামাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব চালু রাখে। ১৪ জুন ২০০৭ সালে পশ্চিমাদের ইন্ধনে ধর্মনিরপেক্ষ মাহমূদ আব্বাস ইসলামপন্থী হামাসকে বরখাস্ত করে। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ঐদিনই হামাস গাযা দখল করে নেয়। তারপর থেকে গাযার উপর সকল প্রকার অবরোধ চলকে থাকে। গাযার উপর অবরোধের ফলে বর্তমানে সেটা মৃত্যুপুরীতে রুপান্তরিত হয়েছে। তারা সুড়ঙ্গ তৈরি করে মিসর হতে খাদ্য, পানীয়, ঔষধ ইত্যাদি সরবরাহ করছে। আর এজন্য ইসরাঈলী বাহিনী তাদের সুড়ঙ্গগুলো ধ্বংস করতে কামান ও বোমা সহ বিভিন্ন ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করছে। গাযা ছাড়া ফিলিস্তীনের সকল স্থানে ইসরাঈলী সেনাদের অবাধ চলাচল; কিন্তু বর্তমানে হামাস এবং ফাতাহর মধ্যে একটি সমঝোতার পরিবেশ দেখা দিয়েছে, হামাস ও ফাতাহ যাতে একত্রিত হতে না পারে এই কারণে গাযার উপর অমানবিক আচরণ ও আগ্রাসন। এদিকে গাযার উপর বারবার আক্রমণ, অবেরোধ এবং সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হামাস যখন রকেট নিক্ষেপ করছে, তখন তারা সন্ত্রাসী। আর ২০০৭ হতে সকল দিক দিয়ে গাযার উপর অবরোধ এবং ১৯৪৮ হতে আজ পর্যন্ত ইসরাঈল এবং পশ্চিমা বিশ্ব লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মুসলিমদেরকে রক্তের গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে তারা আজ শান্তি রক্ষী? তাইতো অকুতোভয় মুহাম্মাদ সাঈফ আল-সাহাফ বলেছিলেন, 'বুশ-ব্লেয়ারের পায়ের নিচে বসে থাকা এক পতিতালয়ের নাম জাতিসংঘ'।

ইসরাঈলী আগ্রাসন মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধের নির্দশন :

প্রথম মহাযুদ্ধ শতবর্ষ পূর্তি হয় ২০১৪ সালে। মাঝখানে দ্বিতীয়। এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলামত অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে চলমান মহাযুদ্ধের পার্থক্য হচ্ছে, সেসব যুদ্ধ সম্পর্কে সারাবিশ্বের মানুষ জানত। এখন বার্সিলোনা বা বুয়েন্স আয়ারেসের রাস্তায় চলমান লোকজন বুঝতেই পারছে না যে, একটি যুদ্ধ চলছে।

মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরী এবং ওছমানিয়া খেলাফত ধ্বংস করার পরও মুসলিম নেতৃবৃন্দের বোধোদয় হয়নি। প্রতিটি বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি করে ঘটনাকে সাইনবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পারমানবিক বোমা ব্যবহারের ভীতি। মুসলিমদের সঙ্গে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ শুরু করেও তারা যখন লাভবান হতে পারল না; তখন মধ্যপ্রাচ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করে। তবে সেই জন্য নাইন-ইলেভেনের মতো সন্ত্রাসী ঘটনাকে অনুঘটক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই ঘটনার মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল জায়নবাদী ইহুদীচক্র এবং খ্রিষ্টানরা। কিন্তু সেটা না হওয়াতে তারা 'ছায়া যুদ্ধ' শুরু করেছে। মুসলিমদেরকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করে শেষ করে দিচ্ছে। আফগানিস্তানের তালেবানদের কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে আল-কায়েদার মত মুসলিম জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলার পেছনে 'সি আই'-এর ভূমিকার কথা এখন সর্বজনবিদিত। সেই আল-কায়েদাকে দমনের নামে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশে মার্কিনীদের দেশব্যাপী যুদ্ধ চলছে। মুসলিম দেশগুলোতে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইকে চাঙ্গা করার জন্য বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের গোয়েন্দা সংস্থাদের মাঝে সমন্বয় করতে ইসরাইলের 'মোসাদ' কাজ করছে। এর অংশ হিসাবে সিরিয়ার আল-কায়েদাকে যেমন অস্ত্রশস্ত্র দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তেমনিভাবে প্রতিপক্ষ মিলিশিয়াকেও অস্ত্রের যোগান দেওয়া হচ্ছে। এক পক্ষকে পশ্চিমা উৎস হতে অন্যপক্ষকে রাশিয়া হতে। এইভাবে ইসরাইলের বিরুদ্ধে এক সময় লড়াইরত আল-কায়েদা জিহাদী গ্রুপ ও হিজবুল্লাহর শী'আ মিলিশিয়া গ্রুপকে ইরাক এবং সিরিয়ায় পরস্পরের মুখোমুখি রাখা হয়েছে। তাছারা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিমদের মধ্যকার শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্ব। আফগানিস্তান, ইরাক শেষ। সিরিয়াকে মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইসরাঈলের অবস্থান। পাশাপাশি সকল জায়গায় গৃহ যুদ্ধ। এখন ইসরাঈল গাযায় যে হামলা চালাচ্ছে এটা মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ছায়াযুদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণে আনা মানে গোটা মুসলিম বিশ্ব পরিণত হবে পশ্চিমাদের হাতের পুতুলে। এটাই তাদের মুসলিম বিশ্বযুদ্ধ বনাম ছায়াযুদ্ধের মৌলিক উদ্দেশ্য। এটা শুধু মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যান্য অঞ্চলেও কাজ চলছে।

আফ্রিকার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র নাইজেরিয়া থেকে মুসলিম নেতৃত্ব সরানো হয়েছে ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে, সুদানকে দিখণ্ডিত করা হল, মিশরে ব্রাদারহুডকে হটিয়ে ইসরাঈলের অনুগতরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। আলজেরিয়ার জনগণের হাতে ক্ষমতা নেই। মালিতে মুসলিমদের অবস্থা সূচনীয়। আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের অবস্থা আরও করুণ। সেখানে এখনিক ক্লিনসিং (জাতি নিশ্চিতকরণ) চলছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। ইউরোপের খ্রীষ্টানেরা বন্দুকের জোরে প্রায় সমগ্র আফ্রিকা দখল করল। পূর্ব তিমুর ও দক্ষিন সুদান তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

উপসংহার :

ইসরাঈলের পিতা বলে পরিচিত বেনগুরিয়ান বলেছিলেন, We must terror, assassination, Intimidation, land, confiscation and the catting of all social services to rid the galilee of its arab population. তাই তারা তাদের পিতার ঘোষণা অনুযায়ী ভয় প্রদর্শন, সন্ত্রাসী, গুপ্তহত্যা, জমি বাজেয়াপ্ত করা কোনটার ব্যত্যয় করেনি। হবেও না কোনদিন। অতএব হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ! ঐক্যবদ্ধ হৌন! আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরুন ও দলে দলে বিভক্ত হওয়া এবং ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত হোন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

[লেখক : ইসলামিক স্টাডিজ, চতুর্থ বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (ক)

دور الجديد : المرحلة الثانية (الف)

জিহাদ আন্দোলন ১ম পর্যায় শহীদায়েন (রহঃ)

حركة الجهاد للشهيدين

(১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) ৫২ বৎসর

মুহাম্মাদী, সালাফী প্রভৃতি লকবগুলি আহলেহাদীছদেরই বিভিন্ন নাম। কোন কোন বিদ্বান সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের আন্দোলনকে শাহ অলিউল্লাহ প্রবর্তিত ‘তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া’ আন্দোলন বলতে চেয়েছেন[১৬৯] এবং আহলেহাদীছদেরকে সেই আন্দোলনেরই একটা বিচ্ছিন্ন উপদল হিসাবে গণ্য করেছেন।[১৭০] অথচ বাস্তব কথা এই যে, শাহ অলিউল্লাহ বা সাইয়িদ আহমাদ শহীদ প্রচলিত অর্থে পৃথক কোন তরীকার প্রবর্তক ছিলেন না বা আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তাঁদের আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা কোন নতুন আন্দোলন নয়। বরং তাক্বলীদ-নির্ভর যে ইসলাম ভারতীয় মুসলিম সমাজে চালু ছিল, শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ ইসমাঈলের শিক্ষা তার বিপরতী। আমল বিল-হাদীছের প্রতি মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা ও বিদ্বানদের উদ্ভাবিত তরীকার বদলে সরাসরি রাসূলের হাদীছের অনুসরণের আহ্বানই ছিল অলিউল্লাহ, শাহ ইসমাঈল, সাইয়িদ আহমদ ও বেলায়েত আলীর আন্দোলনের মূল সূর। তাঁদের এই দাওয়াত ছিল মূলতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই প্রতিধ্বনি। এব্যাপারে নিজের তরীকা সম্পর্কে সাইয়িদ আহমাদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ‘আমার তরীকা হ’ল তা-ই, যা আমার উর্ধ্বতন দাদা সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ (ছাঃ) এখতিয়ার করেছিলেন। একদিন শুক্না রুটি পেটভরে খেয়ে নিই আল্লাহ্র শুক্রিয়া আদায় করি। একদিন ভুল থাকি ও ধৈর্য ধারণ করি’।[১৭১]

অন্য একস্থানে সাইয়িদ ছাহেব বলেন ‘আমরা সকলে রাব্বুল ‘আলামীনের নির্দেশসমূহের পায়রাবী এবং নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পুনর্জীবন উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজন ছেড়ে এসেছি, ভাই-বন্ধু ও দেশ ছেড়ে এখানে হিজরত করেছি’।[১৭২]

উপরোক্ত দু’টি বক্তব্যে সাইয়িদ আহমাদের আন্দোলনের মূল বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমঃ তিনি রাসূলের তরীকাকেই নিজের তরীকা বলে দাবী করেছেন। তাঁর এই দাবী কেবল ক্ষুধা সহ্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সকল ব্যাপারেই তিনি এর নমুনা হতে সচেষ্ট ছিলেন। একদা তিনি দিল্লীর বিখ্যাত আলেম ও তাঁর হাতে বায়‘আতকারী মাওলানা আবদুল হাইকে বলেন, ‘আমার মধ্যে সুন্নাতবিরোধী কিছু দেখলে আমাকে সাবধান করে দিবেন’। তখন মাওলানা তাকে বললেন, ‘আপনার মধ্যে সুন্নাতবিরোধী কিছু দেখলে আবদুল হাই আপনার সাথে থাকবেই বা কতক্ষণ’?[১৭৩]

দ্বিতীয়তঃ তিনি সুন্নাতে নববীর পুনর্জীবন দানের জন্য প্রয়াসী ছিলেন এবং যে কোন ত্যাগ ও কুরবাণীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আর সে কারণেই তিনি প্রচলিত তাক্বলীদী রেওয়াজকে অস্বীকার করে বলেন, ‘নবুওয়তের রাস্তা সন্ধানী ব্যক্তির জন্য প্রথম যে বিষয়টি যরূরী, তা হ’ল বিশ্বাস, কর্ম, নৈতিকতা, কথাবর্তা, ইবাদাত প্রভৃতি সকল বিষয়ে শরী‘আতের নিষেধ-সমূহ মেনে চলবে এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে যাচাই-বাছাই করে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যদি নিজে কুরআন ও সুন্নাহর আলেম হন তাহ’লে ভাল। নইলে মুহাদ্দিছ বিদ্বানদের নিকট থেকে জেনে নিবে’।[১৭৪]

এখানে তাক্বলীদের নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুস্থানে প্রচলিত হানাফী মাযহাবের তাক্বলীদ করার জন্য তিনি মুরীদকে নির্দেশ দিচ্ছেন না। বরং আলেম হলে তিনি নিজেই কুরআন-হাদীছ যাচাই-বাছাই করবেন। না হ’লে কোন তাক্বলীদপন্থী বিদ্বানকে জিজ্ঞেস না করে বরং হাদীছপন্থী আলিম বা মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের নিকট থেকে মাসআলা জেনে নেবার নির্দেশ দিচ্ছেন।

এই সকল কারণে যদি তাঁকে কেউ মুক্বাল্লিদ না বলে ‘মুহাম্মাদী’ বলেন এবং সাধারণ তরীকাসমূহের বাইরে তাঁর তরীকাকে ‘তরীকায় মুহাম্মাদিয়া’ বলেন, তবে আক্ষরিক অর্থে তা অবশ্যই বলা যাবে। কিন্তু তাঁকে ভারতে প্রচলিত কাদেরিয়া, চিশতিয়া,

---

১৬৯. Dr. Azizur Rahman Mallick, BRIRISH POLICY OF THE AND THE MUSLIMS IN BENGAL (1757-1856) Dacca: Bangla Academy, 1977, 7. 110.

১৭০. Dr. Muin-ud-din Ahan, "HISTORY OF THE FRAIDI MOVEMENT." (Dhaka: Islamic Foundation, 1984.) p. 57, 67. [Althoug Tariqah-i-Muhammadiyah movement was started as a religioun refrom movement about A. D. 1818, it took a political turn within few years and spread throughout Indo-pakistan sub-continent with Extra ordinary rapidiry. In course of time, it also split up into three distinct groups, namely the patna school, Ta'aiyni (movement of Karamat Ali) and AhI-i-Hadith. p. 57. The new school which came out of the patna school, called itsellf 'Muhammadi' and 'AhI-i-Hadith'. Later on they came to be widely known as AhI-i-Hadith and Rafi-yadayn' ..... In the present study they are refferred to as AhI-i-Hadith. p. 67.]

১৭১. طرقہ من طریقہ جد خود سید المرسلین است- یک روز نان خشک سیر می خورم وشکر خدا بجا می آرم- ویک روز گرسنہ می مانم و صبر می کنم. গোলাম রাসূল মেহের ‘জামা‘আতে মুজাহেদীন’ (লাহোর : গোলাম আলী এন্ড সন্স, সালবিহীন), পৃঃ ৬৯।

১৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮।

১৭৩. নাদবী, ‘সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ’, পৃঃ ৩৬৭।

১৭৪. ‘ছিরাতে মুস্তাক্বীম’ (উর্দূ), পৃঃ ২১৪।

নক্শবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া প্রভৃতি তরীকার ন্যায় নিয়মবদ্ধ কোন বিশেষ একটি তরীকা হিসাবে গণ্য করা চলে না। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সাইয়িদ আহমাদ নিজে কখনো নিজের সংস্কার আন্দোলনকে 'মুহাম্মাদী' আন্দোলন বলেননি।[১৭৫] তবু তাঁর অনুসারী আহলেহাদীছগণ নিজেদেরকে তখন 'মুহাম্মাদী' হিসাবেই পরিচয় দিতেন বা এখনও দিয়ে থাকেন এ অর্থে যে তাঁরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ ব্যতীত অন্য কারু কোন মত-এর অনুসরণ করেন না।

জনৈক ইংরেজ লেখকের মত অনুযায়ী 'শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর অনুসারীগণ নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন'। তিনি বলেন যে, 'মুজাহেদীন জামা'আত দু'টি পরস্পর বিরোধী গ্রুপে বিভক্ত ছিল। একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন মাওলানা আবদুল হাই ও মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, যারা আহলেসুন্নাত-এর তরীকা অনুসরণ করতেন। অন্য গ্রুপটির নেতা ছিলেন মৌলবী ইসমাঈল। যিনি চার ইমামের তাক্বলীদ হ'তে মুক্ত ছিলেন এবং সরাসরি হাদীছকে দলীলের উৎস গণ্য করতেন। স্বয়ং সৈয়দ আহমাদ 'আমলের দিক দিয়ে 'হানাফী' হ'লেও মৌলবী ইসমাঈলের উপর নেতৃত্ব করতেন, যিনি নিজেকে 'মুহাম্মাদী' বলতেন'।[১৭৬] বাংগালী গবেষক আবদুল মওদূদ তার 'ওহাবী আন্দোলনের রূপরেখা' নামক নিবন্ধে বেলায়েত আলী সম্পর্কে বলেন, '১৮২০ সালে সৈয়দ আহমাদের চরজন খাছ খলীফার অন্যতম মওলবী বেলায়েত আলী বাংলাদেশে হিজরত করেন এবং খাছ জিহাদ আন্দোলনের বিশেষ অনুশাসন ও শিক্ষাগুলি বাংলাদেশে প্রয়োগ করতে জোর দেন। নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠশেষে প্রত্যেকবার উপরদিকে হাত তোলার ও উচ্চকণ্ঠে 'আমীন' বলার বিধি তিনিই বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন। তাঁর শিক্ষার সারমর্ম ছিল, কুরআনের পরেই হাদীছ মুসলমানদের একমাত্র অনুসরনীয় ব্যবস্থাপত্র'।[১৭৭]

ছাদেক্বপুরী পরিবারের উপরে বিশেষভাবে লিখিত প্রতিপাদ্য গ্রন্থ 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ'-তে লেখক মাওলানা আবদুর রহীম ছাদেক্বপুরী (১২৫২-১৩৪১/১৮৩৬-১৯২৩) স্বীয় মেজ চাচা ও পরবর্তী আমীরুল মুজাহেদীন মাওলানা এনায়েত আলী, যাকে মাওলানা বেলায়েত আলী বাংলাদেশ অঞ্চলে তাবলীগের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ ও ধৈর্যের সাথে ভ্রমণ করেছেন। তিনি লাখো মানুষকে অন্ধকার গহ্বর হ'তে টেনে এনে হেদায়াতের আলোক-বর্তিকার একনিষ্ঠ প্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদেরকে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণের প্রতি আগ্রহী করেছেন। তাঁর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও তাঁদের উত্তরাধিকারী সন্তান-সন্ততিগণ আজও বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে 'মুহাম্মাদী' নামে পরিচিত'।[১৭৮]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) ১৯১৩ সালে একবার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। তিনি পশ্চিম বাংলার দুমকা ও মুর্শিদাবাদ যেলার কয়েকটি গ্রাম যেমন দিনাজপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর ও বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাই নবাগঞ্জ যেলাধীন নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রাম সফর করেন। পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় 'আখবারে আহলেহাদীছ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেখানে একস্থানে তিনি বলেন, '...আমি এই সফরে কেবলি চিন্তা করেছি বাংলাদেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা এত বেশী কিভাবে হ'ল ও কার দ্বারা হ'ল। আমাকে বলা হ'ল যে, এসব মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর বরকতেই হয়েছে'।[১৭৯]

বাংলাদেশে 'মুহাম্মাদী' বলতে সর্বদা আহলেহাদীছকেই বুঝানো হয়। যেমন 'আকীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ' নামে বই প্রকাশ প্রভৃতি'।[১৮০]

এক্ষণে মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী যদি হানাফী মাযহাবের অনুসারী হ'তেন, তাহ'লে তাঁদের তাবলীগে লোকেরা কিভাবে হানাফী মাযহাব ছেড়ে মুহাম্মাদী বা আহলেহাদীছ হ'ল? একই জিহাদ আন্দোলনের শরীক মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (১২১৫-১২৯০/১৮০০-১৮৭৩) তাবলীগে বাংলাদেশের লোকেরা কেন তাহ'লে হানাফী মাযহাব ছেড়ে আহলেহাদীছ হ'ল না?

প্রকৃত কথা এই যে, বালাকোট-পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসর শিখবিরোধী জিহাদে আমীর সাইয়িদ আহমাদ ও সেনাপতি শাহ ইসমাঈলের সঙ্গে আহলেহাদীছ হানাফী সকল দলের লোক যুক্ত ছিলেন। কিন্তু শাহ ইসমাঈলের বিরোধী আলিমদের প্ররোচনায় অনেকে জিহাদ থেকে সরে পড়েন। মৌলবী মাহবূব আলী দেহলভীর মত আলিম একদল মুজাহিদ নিয়ে দিল্লী থেকে সীমান্তের পাঞ্জতার মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌঁছে জিহাদে অংশগ্রহণ না করেই দলবল নিয়ে হিন্দুস্থানে ফিরে আসেন। শুধু তাই নয় যাতে হিন্দুস্থান থেকে কোন লোকজন ও রসদপত্র সীমান্তে আর যেতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করেন। পরে মাওলানা ইসহাক দেহলভী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূবের প্রচেষ্টায় পুনরায় লোক প্রেরণ শুরু হয়। মৌলবী মাহবূব ও তার জীবনীকার মিরযা হায়রাত দেহলভীর ভাষায় ঐ ধরণের মারাত্মক ক্ষতি শিখ ও পাঠান দূররাণী বিশ্বাসঘাতকরাও করেনি।[১৮১] *[ক্রমশ]*

[লেখক : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৫৯-২৬৪]

---

১৭৫. Dr. Muin uddin Ahmad Khan, History of the TARAIDI MOVMENT. p. 41.

১৭৬. 'তাহরীকে জিহাদ', পৃঃ ৩২।

১৭৭. আবদুল মওদুদ, 'ওহাবী আন্দোলন' (ঢাকা : আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫), পৃঃ ১১২।

১৭৮. 'তাহরীকে জিহাদ', পৃঃ ৩৭।

১৭৯. সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' (অমৃতসর : ২৫শে এপ্রিল ১৯১৩)।

১৮০. (লেখকের পিতা) মাওলানা আহমাদ আলী (সাং বুলারাটি, পোঃ আলীপুর, যেলা-সাতক্ষীরা) রচিত উক্ত পুস্তিকার নাম থেকে উক্ত বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের প্রফেসর ডঃ মঈনুদ্দীন আহমাদ খান তাঁর পি,এইচ-ডি থিসিসে। নাম : History of the Faraidi movement, পৃঃ ৪১।

১৮১. মিরযা হায়রাত দেহলভী, 'হায়াতে তাইয়িবা', পৃঃ ৩২৬।

আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ

পাবনার অভিভাষণ

[১৯৪৭ সালের ৯ই ও ১০ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত পাবনা যেলা আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্সে তৎকালীন 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত অভিভাষণ]

(১ম কিস্তি)

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছাহেব, প্রতিনিধিবর্গ ও সমাগত বন্ধুগণ!

পাবনা যেলা আহলেহাদীছ কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতি মনোনীত করায় আমি যে গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি, তজ্জন্য আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার অযোগ্যতা ও শারীরিক অক্ষমতার কাহিনী সম্যকরূপে আপনাদের বিদিত থাকা সত্ত্বেও এবং পুনঃ পুনঃ আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও আমি যে এই গুরুভারের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই, তজ্জন্য যুগপৎভাবে হর্ষ ও বিষাদের এক অপূর্ব ভাব আমার ভিতর উদ্রিক্ত হইয়াছে। আনন্দের কারণ হইতেছে, আমার প্রতি আপনাদের গভীর স্নেহ ও বিশ্বাস সকল দিক দিয়া রিক্ত ও বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলার আহলেহাদীছ জনমণ্ডলীর নিকট হইতে যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা আমি লাভ করিয়া আসিতেছি আমার নিস্ফল জীবনের ইহাকেই আমি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলিয়া মনে করি। যাহাতে এই স্নেহ ও বিশ্বাসের আমি যথোপযুক্ত পাত্র হইতে পারি করুণা-নিধান আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার তাহাই আকুল প্রার্থনা।

কিন্তু বন্ধুগণ! যখন আমি দেখিতে পাই যে সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু যশস্বী আহলেহাদীছ সুসন্তান বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আহলেহাদীছগণের জীবন মরণ সমস্যার সন্ধিক্ষণে তাহাদিগকে পরিচালিত করার এমন কি তাহাদের নিজস্ব সভা সমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না এবং এই সকল কার্যের জন্য অযোগ্য, অক্ষম ও মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে টানিয়া বাহির করিতে হয়, তখন দুঃখে ও লজ্জায় সত্যই আমার মস্তক অবনত হইয়া আসে।

ভ্রাতৃগণ! সমাজের এই দুরবস্থা ও লজ্জাকর পরিস্থিতির দুইটি কারণ আমি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রধান ও প্রথম কারণ, Inferiority Complex 'সৎসাহসের অভাব ও মানসিক দুর্বলতার প্রভাব'। সুলভ জনপ্রিয়তা লাভ করিবার জন্য আমাদের মাননীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সমাজের সংশ্রব বর্জন করিয়াছেন; এমন কি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্বস্বীকৃত বিদ'আতী প্রতিষ্ঠান সমূহেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন; কিন্তু আহলেহাদীছগণের কোন নিজস্ব কার্য ও তৎপরতা তাহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের দেখাদেখি বাজারে সস্তা নেতার দলের মধ্যে আজ অনেকেই **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর সহিত তাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া বসিয়া আছেন। চাকুরিজীবী ও ছাত্রসমাজের মধ্যে এই মানসিক পীড়া উৎকটভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ফলে আজ অনেকের মনে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে এবং অদ্যকার অবস্থা যদি আগামী কল্যের পূর্বাভাষ হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান অবস্থায় প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে আহলেহাদীছ সমাজের বিলুপ্তি অবধারিত হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ সংকটের ভিতর পাবনা টাউনের আহলেহাদীছগণ যেলা আহলেহাদীছ কনফারেন্সের অধিবেশন আহ্বান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আত্মরক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পৃথিবীর সকল দল ও আন্দোলনের মত যদি আহলেহাদীছগণেরও থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকার প্রচেষ্টা কখনও নিন্দনীয় হইতে পারে না।

সমাজের এবং **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর বর্তমান দুরবস্থার আর একটি কারণ এই যে, অজ্ঞতার তুল্য শত্রু আর কিছুই নাই। আহলেহাদীছ গোষ্ঠী এবং উক্ত আন্দোলনের কার্যক্রমের সহিত পরিচয় লাভ না করার দরুন যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-কে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন; স্বয়ং আহলেহাদীছগণের বর্তমান বংশধররাও উক্ত অজ্ঞতা নিবন্ধন আত্মবিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কুরআনে হাকীম আত্মবিস্মৃতিকে অনাচার-ফিসক নামে অভিহিত করিয়াছে এবং বিশ্বাসী দল যাহাতে আত্মবিস্মৃতির মহামারীতে আক্রান্ত না হন তজ্জন্য এই ভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছে : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'যে সকল জাতি আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, হে মুসলমিগণ! তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। কারণ তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া তাহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ আপনাদের সত্তাকেই ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে অনাচারী' *(হাশর ৫৯/১৯)*।

আজিকার আহলেহাদীছ কনফারেন্স উল্লিখিত অজ্ঞতার বেড়াজালকে ছিন্ন করিবার পক্ষে সহায়ক হউক, সর্বসিদ্ধিদাতা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা ইহাই সমবেতভাবে প্রার্থনা করিব।

وإن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيت.

মুসলিমদের মধ্যে ফের্কাবন্দী বা দলগত ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি কায়েম হইবার পূর্বে আহলেহাদীছ এবং মুসলিম উভয় শব্দের তাৎপর্য এক ও অভিন্ন ছিল। যাঁহারা মুসলিম ছিলেন তাঁহারা সকলেই আহলেহাদীছ ছিলেন। ইমাম হাকেম তাঁহার মুস্তাদরাক এবং হাফিয খতীব বাগদাদী তাঁহার 'শরফু আছহাবুল হাদীছ' গ্রন্থে সনদসহ বর্ণনা করিতেছেন যে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখিতে পাইলে বলিতেন, মারহাবা! রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর ওছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) আমাদিগকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করিয়া দিবার অর্থাৎ স্থান দান করিবার ও তোমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বুঝাইবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত ও আমাদের পরবর্তী আহলেহাদীছ। হাকেম এই হাদীছকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুরূপ বিশুদ্ধ বলিয়াছেন *(মুস্তাদরকে হাকিম ১/৮৮ পৃঃ, তলখীস যাহাবীসহ; শরফ আসহাবুল হাদীছ, পৃঃ ২১)*।

আবু সাঈদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিষ্য ছিলেন এবং ১২টি যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। বুখারী ও মুসলিম তাঁহার বাচনিক সর্বশুদ্ধ ১ হাযার ১ শত সত্তরটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ৭৪ হিজরীতে তিনি মদীনায় পরলোক গমন করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর শিষ্যমণ্ডলীকে আহলেহাদীছ নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ছাহাবীদের শিষ্যমণ্ডলী তাবেঈগণকেও আহলেহাদীছ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবেও ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) আহলেহাদীছরূপে পরিচিত ছিলেন। হাফিয খতীব বাগদাদী তাঁহার ইতিহাসের ৩য় খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন ও হাফেয যাহাবী তাঁহার তাবাক্বাতের প্রথম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম শা'বী ৪৮ জন ছাহাবীর নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করেন এবং ৫ শত ছাহাবীকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন, তিনি সমুদয় ছাহাবীকে আহলেহাদীছ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম শা'বী বলিয়াছেন, ما حدثت الا بما اجمع عليه اهل الحديث قال الذهبي يعني به الصحابة رضي الله عنهم– 'যে সকল মাসআলায় আহলেহাদীছগণ একমত হইয়াছেন, আমি কেবল সেইগুলি বর্ণনা করিয়াছি। হাফেয যাহাবী বলিতেছেন যে, ইমাম শা'বী আহলেহাদীছ শব্দদ্বারা ছাহাবীদের দলের কথা বুঝাইয়াছেন' *(তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৭৭ পৃঃ)*।

শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী শা'বী স্বয়ং আহলেহাদীছরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। *(দেখুন বাগদাদীর তারীখ ১/২২৭ পৃঃ)*। উস্তায আবু মানছুর বাগদাদী তাঁহার 'উছূলুদ্দীন' গ্রন্থে বলিতেছেন,

ثغور الروم والجزيرة ثغور الشام ثغور واذربيجان وباب الابواب كلهم علي مذهب الهل الحديث من أهل السنة وكذالك ثغور أفريقية وأندلس وكل ثغور وراء بحر المغرب اهله من اصحاب الحديث وكذالك ثغور اليمن علي ساحل الزنج واما ثغور أهل ما وراء النهر في وجوه الترك والصين فهم فريقان : إما شافعية و إما من أصحاب أبي حنيفة–

'রূম সীমান্ত, আলজিরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান, বাবুল-আবওয়াব (মধ্য তুর্কিস্থান) প্রভৃতি স্থানের সকল মুসলমান অধিবাসী আহলেহাদীছ মাযহাবের উপর ছিলেন। অনুরূপভাবে আফ্রিকার সীমান্ত, স্পেন এবং পশ্চিম সাগরের পশ্চাদবর্তী সকল সীমান্তের মুসলমান অধিবাসীবর্গ আহলেহাদীছ ছিলেন। পুনশ্চঃ আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়ামেনের সমুদয় সীমান্তবাসী আহলেহাদীছ ছিলেন। তবে তুরস্ক ও চীন অভিমুখী মধ্য তুর্কিস্থান সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে দুইট দল ছিলঃ একদল শাফেঈ ও একদল আবু হানীফার অনুসারী' *(উছূলুদ্দীন ১/৩১৭ পৃঃ)*।

উল্লিখিত স্থানসমূহে ছাহাবী ও তাবেয়ীন কর্তৃক প্রাথমিক উপনিবেশগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। যথা : **শাম** বা **সিরিয়া** দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূকের সময় ১৪ হিজরীতে আমিনুল উম্মৎ আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ এবং বীর কেশরী সায়ফুল্লাহ খালেদ বিন ওয়ালীদ জয় করেন।

মেসোপটেমিয়াও ওমরের শাসনকালে সা'আদ বিন আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে বিজিত হয়।

আযারবাইজানও তাঁহার সময়ে মুগীরা বিনে শু'বা কর্তৃক ২২ হিজরীতে অধিকৃত হয়।

আফ্রিকা ৩য় খলীফা ওছমানের শাসনকালে ২৭ হিজরীতে ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন ও মহাবাহু আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ প্রভৃতি ছাহাবীগণ অধিকার করেন।

স্পেন : সর্বপ্রথম ওছমানের শাসনকালে ২৭ হিজরীতে আব্দুল্লাহ বিন নাফে' প্রভৃতি স্পেনে সৈন্য পরিচালনা করেন। অতঃপর ৯২ হিজরীতে বীর কেশরী তারিক বিন যিয়াদ উহা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লন।

হিন্দ : ওমরের শাসকালে ১৪ হিজরীতে বাহরায়েনের শাসনকর্তা ওছমান বিন আবুল 'আছের নির্দেশক্রমে ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ সর্বপ্রথম বর্তমান বোম্বাই নগরীর ২১ মাইল দূরবর্তী থানা নামক বন্দর আক্রমণ করেন। ইহার অনতিকাল পরেই ওছমান বিন আবুল 'আছের সৈন্যদল 'উচ' অধিকার করেন। অতঃপর ১৭ হিজরীতে মুগীরা বিন শু'বা সিন্ধুর বন্দর দিবলের উপর সৈন্য পরিচালনা করেন। ৪৪ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়াহ্র রাজত্বকালে মুহাল্লাব বিন আবি সোফরার নেতৃত্বাধীনে মুসলমি সৈন্যগণ পুনরায় অভিযান করেন এবং আব্দুর রহমান বিন আবু সামুরা কাবুল জয় করিয়া লন। ৮৬ হিজরীতে দিবলের জলদস্যুরা সিংহলের মুসলিম উপনিবেশের কতিপয় নারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় ইরাক অধিপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাহার সম্পদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা পিতৃব্যপুত্র ইমাদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন কাসেমকে দিবলাধিপতি সম্রাট দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সম্রাট দাহিরকে পরাস্ত করিয়া মুহাম্মাদ বিন কাসেম হিন্দে স্থায়ীভাবে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য ভূপর্যটক ও ঐতিহাসিক শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বেশারী মাক্বদেসী ৩৭৫ হিজরীতে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। সিন্দুর তৎকালীন রাজধানী মানছুরার অবস্থার আলোচনা প্রসংগে তিনি লিখিয়াছেন, 'অধিবাসীবর্গ যোগ্য ও সদাশয়। এই স্থানে ইসলাম সজীব আছে এবং বিদ্যা ও বিদ্বানগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা ধীশক্তি সম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানশীল, পুণ্যবান, ধর্মভীরু ও দানশীল। অমুসলমিগণ সকলেই প্রতিমা-পূজক আর মুসলমিগণ অধিকাংশই আহলেহাদীছ' *(আহসানুত্ তাকাসীম, পৃঃ ৪৮)*।

ভ্রাতৃগণ! আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, ছাহাবী ও তাবেঈন কর্তৃক পৃথিবীর যে সকল প্রান্তে মুসলিম উপনিবেশসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার অধিবাসীবৃন্দ সকলেই আহলেহাদীছ ছিলেন। বিশষতঃ হিন্দের সকল মুসলিম উপনিবেশে ইসলামের প্রথম আর্বিভাবের সময় হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আহলেহাদীছ দল প্রবল ছিল। পরবর্তীকালে ইসলাম জগতে ফির্কাবন্দী প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত মুসলমিগণের প্রতি পালনীয় দল ছিল একমাত্র আহলেহাদীছ।

ইসলাম আহলেহাদীছ দলের নামান্তর ছিল বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে তখন আহলেহাদীছরূপে অভিহিত হইবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। কিন্ত উত্তরকালে যখন খারেজী ও শী'আদের দল প্রতিষ্ঠিত হইল, ই'তেযাল ও ইরজার ফেতনার সংগে সংগে কিতাব ও সুন্নাতের পবিত্র সলীলে রায় ও কিয়াসের আবর্জনা মিশ্রিত হইতে লাগিল, তখন রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর তরীকাপন্থীগণের জন্য দুইটি পথ মুক্ত ছিল। যথা :

প্রথম পথ : খারেজী ও শী'আরা যেরূপ পৃথিবীর সকল মুসলমিকে কাফের বলিয়া প্রচার করিয়া কেবল নিজেদের জন্য

মুমিন ও মুসলিমদিগকে কাফের ঘোষণা করিয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকাপন্থীগণের শুধু আপন দলের জন্য মুসলিম নাম পরিগ্রহ করা।

দ্বিতীয় পথ : খারেজী, রাফেযী, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, মুরজিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত দলকে মুসলিমরূপে গণ্য করা এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক একটি নাম আপন দলের জন্য মনোনীত করা। রাসূলের তরীকাপন্থীগণের পক্ষে ভ্রান্ত দলসমূহের তাকফীর করার উপায় ছিল না। কারণ এই তরীকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে কোনরূপে পাপ বা কাবীরা গোনাহের জন্য তাঁহার কোন মুসলিমকে কাফের ও রাফেযী দলসমূহের এই স্থান হইতে মৌলিক প্রভেদ। রাফেযীরা আবুবকর, ওমর, ওছমান এবং লক্ষাধিক ছাহাবীকে কাফের বলিয়া থাকে আর খারেজীরা আবুবকর ও ওমর এবং তাঁহাদের সময়ে যাঁহারা পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মুসলিম বলিয়া স্বীকার করে; কিন্তু পরবর্তী সমুদয় ছাহাবী ও তাবেঈন, যাঁহারা খারেজীগণের মতবাদ বরণ করিয়া লন নাই তাঁহাদের সকলকেই কাফের বলিয়া থাকে। শুধু মত বৈষম্যের দরুন জাতীয় দেহের অঙ্গচ্ছেদের এই বিদ'আত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকাপন্থীগণ কখনও সমর্থন করিতে পারেন নাই। কাজেই বিদ'আতী শি'আ ও খারেজী দলের তাকফীর করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আর অদ্যকার সুবিধাবাদী Inferiority Complex রোগাক্রান্ত অথবা সুলভ জন-প্রিয়তালোভী Cheap popularity monger-দের মত সুন্নাত ও বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ, তাক্বলীদ ও ইত্তেবা সমস্তই একাকার করিয়া রেকাবী মাযহাবের পত্তন করা ও তাঁহাদের ক্ষমতার অতীত ছিল, তাই সকল দলের জন্যই মুসলিম আখ্যার দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহারা আপনাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত এবং ছাহাবীগণের পরিগৃহীত আহলেহাদীছ নাম গ্রহণ করিলেন।

ইমাম আবু হানিফার আমলেও এই আহলেহাদীছ দল সমভাবে বিদ্যমান ছিল। ইমাম ছাহেব যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন সরস খেজুরের সহিত শুষ্ক খেজুরের বিনিময় সুসিদ্ধ কি-না তাহা লইয়া আহলেহাদীছ দলের সহিত তাঁহার বিতর্ক উপস্থিত হয় *(হেদায়ার টীকা এনায়া, ৫ম খণ্ড, ২৯২ পৃঃ)*। তাতারখানিয়া ও ফাতাওয়া হাম্মাদীয়ার হুদূদ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবুবকর জওযজানীর সময়ে জনৈক হানাফী কোন আহলেহাদীছের নিকট তাহার কন্যার পাণি প্রার্থী হয়, আহলেহাদীছ লোকটি বলে যে, হানাফী তাহার মাযহাব ত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করিতে এবং রুকূতে যাওয়া এবং রুকূ হইতে উঠার সময় হস্তোত্তলন 'রফউল ইয়াদায়েন' প্রভৃতি আহলেহাদীছ পরিচায়ক কার্যাদি করিতে প্রস্তুত না হইবে, ততক্ষণ সে হানাফীকে তাহার কন্যা দান করিবে না। হানাফী ব্যক্তি কন্যার পিতার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইমাম আবুবকর জওযজানীকে এই বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি মাথা নীচু করিয়া থাকেন ও বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে ফাতাওয়া দেন *(রদ্দুল মুহতার ৩/১৯০ পৃঃ)*।

ইমাম আবুবকর জওযজানীর নাম আহমাদ বিন ইসহাক। ইনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসানের ছাত্র মূসা বিন সুলায়মান জওযজানীর শিষ্য ছিলেন এবং হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাতারখানিয়া ও ফাতাওয়ায়ে হাম্মাদীয়া গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, বিখ্যাত হানাফী ইমাম আবু হাফছ কাবীরের (জন্ম ১৫০ হিঃ) সময় জনৈক হানাফী আহলেহাদীছের অবলম্বন করে এবং ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করিতে ও 'রফউল ইয়াদায়েন' করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। শায়খ আবু হাফছ এই কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং জল্লাদের সাহায্যে প্রকাশ্যস্থলে উক্ত আহলেহাদীছকে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিবার জন্য সুলতানকে বাধ্য করেন। অবশেষে বহু লোকের অনুরোধ ক্রমে লোকটি তওবা করিলে তাহার প্রাণ রক্ষা হয় *(আল-ইরশাদের টীকা, পৃঃ ১৮৬)*। এই সকল ঘটনার সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এমন একদল লোক বিদ্যমান ছিলেন, যাহারা আহলেহাদীছরূপে আখ্যায়িত হইতেন এবং তাঁহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ও ছালাতে রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হইতে উঠার সময় রফউল ইয়াদায়েন করা।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ ও রফউল ইয়াদায়েনের কার্য মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীরাও করিয়া থাকেন। সুতরাং আহেলহাদীছরূপে যাহাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা বস্তুতঃ মালেকী অথবা শাফেয়ী কিংবা হাম্বলী ছিলেন। ইহার উত্তর স্বরূপ আমি ইহাই বলিব যে, ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ বিন হাম্বলের জন্ম গ্রহণ করার পূর্বেও যে মুসলমিগণ আহলেহাদীছরূপে আখ্যায়িত হইতেন, তাহা ঐতিহাসিক প্রণালীতে প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইমামগণের মাযহাবের সঙ্গে সঙ্গে আহলেহাদীছ গোষ্ঠীর কথা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে ফিক্বহের গ্রন্থসমূহে আলোচিত হইয়াছে।

উপরোক্ত রফউল ইয়াদায়েনের মাসআলা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বাকী যুকানী মালেকী (মৃত ১১২২ হিঃ) বলিতেছেন, আবু মুছ'আব, ইবনে ওয়াহ্হাব ও আশ্হাব প্রভৃতি ইমাম মালেক সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ছালাতে রুকূতে যাইবার ও রুকূ হইতে উঠিবার প্রাক্কালে ইবনু ওমরের হাদীছ অনুযায়ী রফউল ইয়াদায়েন করিতেন। ইমাম আওযাঈ, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক, তাবারী এবং জামা'আতে আহলেহাদীছ ইহাই বলিয়া থাকেন *(শরহে মুওয়াত্ত্বা ১/১৪৩ পৃঃ)*। আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, মাযহাব সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা যুকানী আহলেহাদীছ জামা'আতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মাযহাবকে মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাব সমূহ হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী শাফেঈ (মৃত ৬৬৭ হিঃ) বলিতেছেন, আলেমগণ তাশাহ্হুদ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন যে, উহা পাঠ করা ওয়াজিব না সুন্নাত? ইমাম শাফেঈ ও একদল ফক্বীহ বলিতেছেন, প্রথম তাশাহহুদ সুন্নাত আর দ্বিতীয়টি ফরয। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন, উভয় তাশাহহুদই সুন্নাত। অন্য রেওয়ায়ত অনুসারে ইমাম মালেক শেষ তাশাহহুদকে ওয়াজিব বলিয়াছেন *(শরহে মুসলিম ১/১৪০ পৃঃ)*। আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাশাহহুদ সম্পর্কে আহলেহাদীছগণের মাযহাব সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, যদি কাহারো শরীক বিক্রয় ব্যাপার অবগত থাকে এবং অনুমতিও প্রদান করিয়া থাকে, তথাপি বিক্রয়ের পর যদি হক্কে শোফ'আ দাবী করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার দাবী টিকিবে কি-না সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। ইমাম শাফেঈ, মালেক, আবু হানীফা ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী, উসমানুল বত্তী (মৃত ১৪৩ হিঃ) ইবনু আবি লায়লা প্রভৃতি বলেন, তাহার হক্কে-শোফ'আর দাবী গ্রাহ্য হইবে। ইমাম হাকাম বিন উতায়বা (মৃত ১১৫ হিঃ), সুফইয়ান সাওরী, আবু উবায়দ (মৃত ২২৪ হিঃ) এবং আহলেহাদীছগণের একদল বলিতেছেন, গ্রাহ্য হইবে না। ইমাম আহমাদ কর্তৃক দুই প্রকার উক্তিই বর্ণিত আছে *(শরহে মুসলিম ২/৩২ পৃঃ)*। *[ক্রমশঃ]*

[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' গ্রন্থ, পৃঃ ১-১৩]

মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও হিন্দু শাস্ত্রে কল্কি অবতার : একটি পর্যালোচনা

- আবু নাফিয মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী

প্রারম্ভিক আলোচনা :

মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ) ও মাতা হাওয়া (আঃ) এ কথা সর্বজনবিদিত। মহান আল্লাহ রূহ জগতে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে তিনি তাঁর একত্ব ও স্রষ্টা সম্পর্কে অঙ্গীকার নিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 'যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদের এবং নিজের উপর প্রতিজ্ঞা করালেন যে, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা সকলেই বলল, অবশ্যই আমরা অঙ্গীকার করছি' *(আ'রাফ ৭/১৭২)*। অতঃপর মানবজাতি সময়ের প্রেক্ষাপটে নিজেদের চাহিদামত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যখনই আল্লাহকে ভুলে গিয়ে ত্বাগূতের পূজা অর্চনা শুরু করেছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। মুহাম্মদ (ছাঃ) এমন একজন আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, যিনি সারা বিশ্বের প্রতি রহমত স্বরূপ *(আম্বিয়া২১/১০৭)*। পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলই তাঁর আবির্ভাবের আগাম বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

১. 'আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে (মুহাম্মাদ) যেরূপ চিনে, যেমন চিনে তাদের পুত্রদেরকে' *(বাক্বারাহ ২/১৪৬)*।

২. 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি এটা (অহী) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, আর তোমরা একে (মুহাম্মাদ) কিভাবে অস্বীকার কর? আর বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী (মূসা আঃ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন' *(আহক্বাফ ৪৬/১০)*।

৩. 'ঈসা (আঃ) বললেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তার নাম আহমাদ' *(ছফফ ৬১/০৬)*।

ইহুদী-নাছারাদের বিধান তাওরাত ও ইঞ্জীলে যেমন তাঁর আগমনবার্তা এসেছে, তেমনি হিন্দু শাস্ত্রেও কল্কি অবতার তথা শেষ রাসূলের আবির্ভাব সম্পর্কে যথার্থই বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কখনো কি ভারতবর্ষে নবী-রাসূলদের আগমন ঘটেছে? এ প্রশ্নের জবাব হল, এটা আত্মকেন্দ্রিক কথা ও একতরফা বিচার বিশ্লেষণ নয়। কেননা আল্লাহ বলেন,

(ক) 'আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি' *(দুখান ৪৪/০৫)*। (খ) 'আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকটে রাসূল প্রেরণ করেছি' *(নাহল ১৬/৩৬)*। (গ) 'আমি তোমার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি' *(হিজর ১৫/১০)*। (ঘ) 'পূর্ববর্তীদের নিকটে আমি বহুনবী প্রেরণ করেছিলাম' *(যুখরুফ ৪৩/০৬)*। (ঙ) 'আল্লাহ্র শপথ, তোমার পূর্বেও আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি' *(নাহল ১৬/৬৩)*। (চ) 'এমন কোন সম্প্রদায় নেই, যাদের নিকটে কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি' *(ফাতির ৩৫/২৪)*। (ছ) 'আমি রাসূল না পাঠিয়ে কাউকেই শাস্তি দেয় না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৫)*।

উক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে বসবাসকারী বনী আদমের পূর্ববর্তী পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে কোন এক সময় নবী-রাসূলগণ দ্বীন ইসলাম প্রচার করেছিলেন। হয়ত সে ইতিহাস কালের আবর্তনে চাপা পড়ে গেছে; নতুবা উম্মতে মুহাম্মাদীকে জ্ঞান জানানো হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের মধ্যে কারো কাহিনী বর্ণনা করেছি, আর কারো কাহিনী বর্ণনা করিনি' *(নিসা ৪/১৬৪)*।

তাছাড়া পৃথিবীর ভৌগলিক বিচার বিশ্লেষণ করলে আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কালের আবর্তনে বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ, সাগর-মহাসাগর গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অনুমান করা যায়, সেখানে এক একটি মহাদেশ অপর মহাদেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন- মৃত সাগর (Death Sea) সৃষ্টি হয়েছে লূত (আঃ)-এর যুগে, আটলান্টিক মহাসাগরে জেগে উঠেছে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জ, যমুনার বুকে চর জেগে গড়ে উঠেছে জনবসতি ইত্যাদি ভৌগলিক পরিবর্তন তার জ্বাজল্য প্রমাণ। নূহ (আঃ) ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হলেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। প্লাবন পরবর্তীতে তার সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে নতুন করে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণেই তাকে ابوالبشر الثانى বা 'মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা' বলা হয়।[১৮২] আর তিনিই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম রাসূল।[১৮৩] পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি একই ভূখণ্ডে বসবাস করত এবং পরবর্তীকালে তারা চাহিদামত পৃথিবীর বিভিন্ন চারণ ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে।[১৮৪] মহান আল্লাহ্ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ 'আমরা তাঁর (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি' *(ছাফ্ফাত ৩৭/৭৭)*। উক্ত আয়াতের তাফসীর হল, নূহের প্লাবন পরবর্তীতে কেবল তাঁর তিন পুত্রসহ মুমিন নর-নারীগণই অবশিষ্ট ছিল *(তাফসীর ইবনু কাছীর ৭/২২ পৃঃ)*।

ঐতিহাসিকদের মতে, সবচেয়ে পুরাতন জাতি হল সেমিটিক জাতি।[১৮৫] সেমিটিক শব্দটি আদি বাইবেল (Old testament)-এর সেম্ (Shem)[১৮৬] হতে উদ্ভূত। নূহ (আঃ)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র

১৮২. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী ১/৫৩ পৃঃ।
১৮৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২, 'কিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।
১৮৪. ছীরাতে সারওয়ারে আলম ২/৬ পৃঃ।
১৮৫. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা : আইডিয়াল প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃঃ ১।
১৮৬. মরিস বুকাইল, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান (জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃঃ ৫১।

সাম্ (سام)-এর বংশধর সেমিটিক জাতি নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন أبو العرب বা 'আরব জাতির পিতা'। তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[১৮৭] জনৈক ঐতিহাসিকের মতে, সেমিটিক জাতির আদি বাসস্থান মেসোপটিমিয়া। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮০০ সালে ব্যাবিলন সভ্যতার বিকাশ লাভ করে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হতে ৫০০ সালের মধ্যে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মেসোপটিমিয়া থেকে ফোরাত-দজলা উপত্যকা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, সিনাই এলাকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে।[১৮৮]

নূহ (আঃ)-এর প্লাবন পরবর্তী আ'দ জাতির বাসস্থান ছিল ইয়ামান ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী দক্ষিণ আরবের বিস্তৃত আহক্বাফ এলাকায়। অতঃপর পারস্য উপসাগর উপকূল ওমান ও হাজরামাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত। অর্থাৎ ইয়ামান, সিরিয়া, ওমান, আম্মান, কাতার, হাজরামাউত ও ইরাক এলাকা। আর লূত জাতি খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০-১৯০০ সাল পর্যন্ত ইরাক ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী ট্রান্স জর্ডান এলাকায় বিপুল জনবসতি গড়ে তোলেন।[১৮৯]

আর ঐ সকল এলাকায় বসবাস শুরু হওয়ার বড় প্রমাণ হল মহান আল্লাহ বলেন, 'নূহ (আঃ)-এর নৌকা জূদী পর্বতের উপর স্থির হল' *(হূদ ১১/৪৪)*। তাওরাতের বর্ণনা মতে, আরারাত পর্বতে স্থির হল।[১৯০] কেহ বলেন, পর্বতের নাম জূদী ও স্থানের নাম আরারাত। কিন্তু ইরানীরা ঐ পর্বতের নাম 'কূহে নূহ' বলে অবহিত করেন।[১৯১]

তারা যখন জীবনের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের অন্তরে নিশ্চয় যে কোন একটা ধর্ম বিশ্বাস ছিল; হোক তা একেশ্বরবাদ কিংবা একাধিকেশ্বরবাদ। এমনকি তাদের সাথে ছিল পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের উপর প্রেরিত আসমানী কিতাব, যা কালের চক্রে শয়তানী প্ররোচনায় মানুষ নিজেদের সুবিধা মত পরিবর্তন করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 'তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর তা বুঝে শুনে পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগতও ছিল' *(বাক্বারাহ ২/৭৫)*। নিম্নে হিন্দুদের শাস্ত্র বেদ, পুরাণে বর্ণিত ইসলামের সাদৃশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের যে ভবিষদ্বাণী এসেছে তা আলোচনা হল-

কল্কি অবতারের নাম :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদা তাঁর নাম মুহাম্মাদ রেখেছিলেন এবং মা আমেনা স্বপ্নে এক ফেরেশতার সুসংবাদ পেয়ে নাম রাখেন আহমাদ।[১৯২] এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) নিজেই বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ ও আহমাদ। আমি আল-মাহী, আল-হাশির, আল-আকিব।[১৯৩] আর ক্বিয়ামতের ময়দানে শাফা'আতের স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম হবে মাহমূদ।[১৯৪]

ভাগবত পুরানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'নরাশংস' বা প্রশংসিত[১৯৫] বলা হয়েছে। যার আরবী প্রতিশব্দ 'মুহাম্মাদ'। আবার 'কীরি' হল 'আহমাদ' নামের প্রতিশব্দ। ঋগ্বেদের ভাষায়,

যো ব্রাহ্মনো মাঘ নস্য কীরে।[১৯৬]

সংস্কৃত ভাষায় 'কীরি' শব্দের বাংলা অর্থ 'ঈশ্বরের প্রশংসাকারী'। যার আরবী প্রতিশব্দ হল 'আহমাদ'। আর কল্কি অবতার অর্থ হল, 'খাতামুন্নাবিয়ীন বা শেষ নবী'।

প্রশ্ন হতে পারে, ঈশ্বরের প্রশংসাকারী সকল ব্যক্তিই কী তাহলে 'আহমাদ'? এর জবাব হল, 'আহমাদ' শব্দটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন আহমাদ নামের ব্যাপারে ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষ্যদান, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ 'এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম আহমাদ' *(ছফ ৬১/৬)*।

মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের (মৃঃ ৭৬৮) উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু হিশাম (মৃঃ ৮২৮) জোন লিখিত ইঞ্জীলের (অধ্যায় : ১৫, স্ত্রোত :২৩-২৭ এবং অধ্যায় : ১৬, স্ত্রোত : ১) সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন। উক্ত অনুবাদের মধ্যে তিনি গ্রীক শব্দ 'ফারক্লিত' (Paracletusy/Periclytos) ব্যবহার করার পরিবর্তে 'মুনহান্নামা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপর তারা উভয়ে ব্যাখ্যায় বলেন যে, 'মুনহান্নামা'র অর্থ সুরিয়ানী ভাষায় 'মুহাম্মাদ' এবং গ্রীক ভাষায় Periclytos।[১৯৭] ইঞ্জীলে ঈসা (আঃ) সুসংবাদ দিয়ে বলেন, এরপরে আমি তোমাদের সাথে বেশী কথা বলব না। কারণ দুনিয়ার দলপতি (মুহাম্মাদ) আসছে। তাঁর কিছুই আমার মধ্যে নেই।[১৯৮] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন বার্তা পূর্বোক্ত আসমানী কিতাবে উল্লেখ ছিল বলেই পাদ্রী বুহাইর (জারজিস), ওরাকা বিন নওফেল এবং বাদশা নাজাশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিনতে পেরেছিলেন।

পিতৃ পরিচয় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালেব (শায়বা) ইবনে হাশেম (আমর)[১৯৯] ইবনে আব্দুল মান্নাফ ইবনে কোসাই ইবনে কিলাব।[২০০] মাতার নাম আমিনা

১৮৭. নবীদের কাহিনী ১/৫২ পৃঃ।
১৮৮. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা : আইডিয়াল প্রকাশনী, ১১ সংস্করণ, ১৯৯৩), পৃঃ ৩-৫।
১৮৯. আবুল 'আলা মওদূদী, তাফসীর তাফহীমুল কুরআন, ১০/১২৩ পৃঃ।
১৯০. তাওরাত জন্ম পুস্তক, অধ্যায়-৭: আয়াত-১২-১৩। বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ৫৫।
১৯১. অনুবাদ সিরাজুল ইসলাম, আনোয়ারে আম্বিয়া (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭), পৃঃ ৩৩।
১৯২. রহমাতুল্লিল আলামিন ১/৩১ পৃঃ।
১৯৩. ছহীহ বুখারী হা/৩৫৩২।
১৯৪. রহমাতুল্লিল আলামিন, ১/৩১ পৃঃ, দ্রঃ টীকা-১।
১৯৫. ভাগবত পুরান, বণব্রত সেন সম্পাদিত (হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭), ঋগ্বেদ : সংহিতা, স্কন্ধ-৫, অধ্যায়-৫, শ্লোক-২।
১৯৬. ঋগ্বেদ : সংহিতা, স্কন্ধ-২, অধ্যায়-১২, শ্লোক-৬।
১৯৭. ছীরাতে ইবনে হিশাম ১/২৪৮ পৃঃ; ছীরাতে সারওয়ারে আলম ২/১৭৮ পৃঃ।
১৯৮. ইনজিল শরীফ, ছীরাতে সারওয়ারে আলম ২/১৭৭ পৃঃ।
১৯৯. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহিকুল মাখতূম, অনুবাদ : খাদীজা আখতার রেজায়ী (লণ্ডন : আল-কুরআন একাডেমি ১৪১২হিঃ /১৯৯৯ইং), পৃঃ ৬৯; ছীরাতে ইবনে হিশাম ১/২০ পৃঃ।
২০০. আনোয়ারে আম্বিয়া, পৃঃ-২৯৯।

বিনতে ওহাব ইবনে আব্দুল মান্নাফ ইবনে কোসাই ইবনে কিলাব।[২০১] তিনি বনু যাহরা গোত্রের সরদার কন্যা ছিলেন।[২০২]

ভাগবত পুরানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতার নাম 'বিষ্ণু যশস', 'বিষ্ণু ভাগত' এবং মাতার নাম 'সুমতি', 'সোমবতি' বলা হয়েছে। কল্কি পুরানের ভাষায়,

ভূবনে বিষ্ণূ যশস : কল্কি প্রাদুর্ভবিষাতি।

অর্থ হল, ভবিষ্যতে আগত কল্কি অবতারের পিতার নাম 'বিষ্ণূ যশস'।[২০৩] বিষ্ণূ+যশস= ঈশ্বর+ভক্ত= আল্লাহ+আব্দ= আব্দুল্লাহ। বিষ্ণূ +ভাগত= ঈশ্বর+দাস= আল্লাহ+আব্দ= আব্দুল্লাহ। এখানে সংস্কৃত 'যশস' ও 'ভাগত' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'আব্দ' বা বান্দা।

অন্যত্র পুরানের ভাষায়,

সুমাতাং বিষ্ণূ যশসা গর্ভ মাধও বৈষ্ণবস্

অর্থ হল, তাঁর পিতার নাম 'বিষ্ণূ যশস' ও মাতার নাম 'সুমতি' (সোমবতি) হবে।[২০৪] সু+মতি=শান্তি+আত্মা=আমিনা। আমিনা অর্থ, শান্তিওয়ালী তথা শান্তির আত্মার অধিকারিনী। এ প্রসঙ্গে F.R.Kurishi রচিত গ্রন্থ The Religion of Humanity-তে কল্কি পুরানের ১২ অধ্যায় থেকে বিশেষ উদ্ধৃতাংশ হল, জগৎ গুরু বিষ্ণূ ভাগত ও সুমতির ঔরসে জন্ম গ্রহণ করবেন।[২০৫]

জন্ম তারিখ ও সময় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৯ই রবিউল আওয়াল সোমবার মোতাবেক ২০[২০৬] অথবা ২২শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত কালে ছুবহে ছাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন।[২০৭] সেই বছর ৫৫ দিন পূর্বে হস্তিবাহিনীর যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল এবং সে সময় সম্রাট নওশেরওয়ার সিংহাসনে আরোহনের ৪০ বছর পূর্তি হয়ে ছিল।[২০৮] কল্কি পুরানের ভাষায়,

দ্বাদশ্যাং শুক্ল পক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবম

অর্থ হল, কল্কি অবতারের জন্ম শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তিথির মাধব (বৈশাখ) মাসে হবে।[২০৯]

বাংলা ক্যালেন্ডারের মতে, 'মাধব' বলতে বৈশাখকে বসন্তের মাস বলা হয়। বসন্তের আরবী শব্দ রবি অর্থাৎ ৯ রবিউল আওয়াল মাস। F.R.Kurishi তার গ্রন্থে লিখেছেন, ১২ই বৈশাখ সোমবার সূর্যোদয়ের দু'ঘণ্টা পরে তার আগমন ঘটবে।[২১০] ভারতীয় সময় মতে, জন্মের সময় সূর্যোদয়ের দু'ঘণ্টা পর হলে আরব দেশে সেই সময় হবে ২ ঘণ্টা পূর্বে অর্থাৎ ছুবহে ছাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে। কেননা ভারতের গ্রীনিচমান ৭৫ ডিগ্রি এবং আরবদেশের গ্রীনিচমান ৪৫ ডিগ্রিতে অবস্থিত। অর্থাৎ ৩০ ডিগ্রি সমান দু'ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য।

জন্ম স্থান :

রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) পবিত্র মক্কা নগরী তথা নিরাপদ শান্তির নগরে জন্ম গ্রহণ করেন।[২১১] মহান আল্লাহ্ এই নগরীকে নিরাপদ ও শান্তির নগরী বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'নিরাপদ (মক্কা) শহরের শপথ' *(ত্বীন ৯৫/৩)*। জাহেলিয়াতের যুগেও এই মক্কা নগরী ছিল পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান। এখানে সকল প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ নিষিদ্ধ ছিল এবং তা মহাপাপ বলে গণ্য হত। কল্কি পুরানের ভাষায়,

শম্ভলে বিষ্ণূ যশাসে গৃহে প্রাদুর্ভাবামাহম

অর্থ হল, শম্ভল শহরে প্রধান পুরোহিত গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করবেন।[২১২] 'শম্ভল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। যার অর্থ হল, শান্তি, নিরাপদ। আরবী ভাষায় এই নগরীকে হেরেম শরীফ বা পবিত্র সম্মানিত স্থান, দারুল আমান বা নিরাপদ স্থান, বালাদুল আমীন বা শান্তি ও নিরাপদ শহর বলা থাকে।

কল্কি পুরানের ভাষা অনুযায়ী পৃথিবীকে ছয়টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন: জাম্বু, শাক, কারুষ্ক, কাশ, শাকলী ও সালমান (শম্ভল) দ্বীপ। F.R.Kurishi রচিত গ্রন্থ The Religion of Humanity-তে বলেন, শম্ভল বা সালমান দ্বীপের রাজ নন্দীনীর সাথে তার বিবাহ হবে।[২১৩] আর 'শম্ভল দ্বীপ' হল পবিত্র মক্কা নগরী। 'সালমান' আরবী শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ শম্ভল এবং বাংলায় শান্তি, নিরাপদ। অন্যত্র অর্থবেদের ভাষায়,

নরাশংস উষ্ট্রারস্য প্রবাহনো

অর্থ হল, নরাশংস (মুহাম্মাদ) বাহন হিসাবে উট ব্যবহার করবেন।[২১৪] মহানবী (ছাঃ)-এর জন্মভূমি মরুভূমি এলাকা মক্কা নগরী এবং তিনি সেখানে বাহন হিসাবে উট ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া হিজরতের সময় আবুবকর (রাঃ)-এর উটের পিঠে করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় প্রবেশ করেন।[২১৫] অতএব শম্ভল দ্বীপে যিনি জন্ম গ্রহণ করবেন তিনি আর কেহ নন তিনি হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)।

বিবাহ ও বার জন পত্নী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৫ বছর বয়সে বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। এই বিবাহের পর তিনি ২৫ বছর জীবিত ছিলেন।[২১৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহের পূর্বে বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতিনিধি হয়ে ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। তার ব্যবসায় উত্তরোত্তর মুনাফা দেখে এবং তার কৃতদাস মাইসারের নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও উত্তম গুণাবলীর কথা শুনে বিস্মিত হন। তখন তিনি মনের গোপন কথা তার বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনব্বিহ্‌রের কাছে ব্যক্ত করেন। নাফিসা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে সমস্ত কথা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে রাজি হলেন এবং তার চাচাদের সাথেও এ ব্যপারে পরামর্শ করলেন। তারা বিয়ের পয়গাম পঠালেন এবং কিছু দিনের মধ্যে

২০১. তদেব
২০২. রহমাতুল্লিল আলামিন ১/৩২ পৃঃ।
২০৩. কল্কি পুরান, পর্ব-৩।
২০৪. কল্কি পুরান, অধ্যায়-২; শ্লোক-১৯।
২০৫. মাসিক মদীনা, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুন-২০০০, পৃঃ ১২৩।
২০৬. আনোয়ারে আম্বিয়া, পৃঃ ২৯৮।
২০৭. রহমাতুল্লিল আলামিন ১/৩২ পৃঃ।
২০৮. আর-রাহিকুল মাখতূম, পৃঃ ৭৬।
২০৯. কল্কি পুরান, অধ্যায় : ২, শ্লোক : ২৫।
২১০. মাসিক মদীনা, পৃঃ ১২৩।
২১১. রহমাতুল্লিল আলামিন ১/৩২ পৃঃ।
২১২. কল্কি পুরান, অধ্যায় : ২, শ্লোক : ১৯।
২১৩. মাসিক মদীনা, পৃঃ ১২৩।
২১৪. অর্থবেদ ২০/১২৭/২/২০; কান্ড-৯।
২১৫. রহমাতুল্লিল আলামিন ১/১০৬ পৃঃ; আর-রাহিকুল মাখতূম, পৃঃ ১৯৮।
২১৬. রহমাতুল্লিল আলামিন ১/৩৪ পৃঃ।

বিয়ে হয়ে যায়। এ বিয়েতে বনি হাশেম ও মুযার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[২১৭] বিবি খাদীজা (রাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি।[২১৮]

এ প্রসঙ্গে F.R.Kurishi তার গ্রন্থে বলেছেন, সালমান দ্বীপের (আরব) রাজনন্দীনীর (খাদিজার) সাথে নরাশংসের (মুহাম্মাদ) বিবাহ হবে। বিয়ে অনুষ্ঠানে তার চাচা ও তিন ভাই উপস্থিত থাকবেন।[২১৯] উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তার চাচা আবু তালেব ও তিন ভাই জা'ফর, আক্বীল ও আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে। বিবি খাদীজা (রাঃ) নবুওয়াতের দশম বছর রামাযান মাসে ইন্তেকাল করেন।[২২০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ১২ জন স্ত্রীর ছিলেন। এ ব্যাপারেও হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবিদের সংখ্যা সম্পর্কে অর্থবেদে বলা হয়েছে,

'বধূমতো দ্বিদশ'

অর্থ হল, তাঁর বার জন পত্নী বা স্ত্রী হবেন।[২২১]

শিক্ষা ও নবুওয়াত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা কোন পণ্ডিত শিক্ষকের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। মহান আল্লাহ তাকে উম্মী (নিরক্ষর) করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাকে যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন, ততটুকু তিনি প্রচার করেছেন। তার বিধানদাতা মহান আল্লাহ; কিন্তু শিক্ষক ছিলেন জিবরীল (আঃ)। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى- عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى 'আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। যতক্ষণ না তাঁর কাছে ওহী আসে। তাকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা' *(নাজম ৫৩/৩-৫)*। এ প্রসঙ্গে F.R.Kurishi রচিত গ্রন্থ The Religion of Humanity-তে বলেন, In a cave Pars Ram will educate him. অর্থাৎ পরস্ রাম এক গুহায় তাকে শিক্ষা দেবেন।[২২২] এখানে 'পরস' অর্থ কুঠারড়; 'রাম' অর্থ স্রষ্টা বা আল্লাহ। অতএব 'পরস রাম' অর্থ আল্লাহ্র কুঠার বা আল্লাহ্র শক্তি তথা আল্লাহ্র শক্তিশালী ফেরেশতা জিবরীল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।[২২৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষা জীবন তথা নবুওয়াত শুরু হয়, তার বয়স যখন ৪০ বছর ০৬ মাস ১২ দিন।[২২৪] হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, ৪০ বছর ০১ দিন বয়সে স্বপ্নের মাধ্যমে নবুওয়াতের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তার নিকটে জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রথম ওহী এসেছিল রামাযান মাসের ২১ তারিখ।[২২৫] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম, মৃত্যু ও নবুওয়াত প্রাপ্তির দিন ছিল সোমবার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনা এরকম ছিল, 'তিনি প্রায়ই পানি ও ছাতু নিয়ে মহর হতে কয়েক মাইল দূরে এক নির্জন স্থান হেরা পর্বতের গুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। ঐ গুহার দৈর্ঘ্য ছিল চার গজ ও প্রস্থ ছিল পৌনে দু'গজ।[২২৬]

এভাবে চলে যায় ছয় মাস এগার দিন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আগমন করেন এবং বলেন, اِقْرَأْ 'পড়'। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। জিবরীল (আঃ) তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সজোরে চাপ দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার সব শক্তি যেন নিংড়িয়ে নেয়া হল। এরপর জিবরীল (আঃ) তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়। তিনি আবারও বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। পুনরায় জিবরীল (আঃ) তাঁকে অনুরূপ চাপ দিলেন এবং বললেন, পড়। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) এবারও বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। জিবরীল (আঃ) তৃতীয় বার তাকে জড়িয়ে ধরে অনুরূপ চাপ দিলেন এবং বললেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'পড়, তোমার প্রভুর নামে। যিনি মানুষকে এক ফোঁটা জমাট বাধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। আবার পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ যা জানত না তাই শিক্ষা দিয়েছেন' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরে ফিরে বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর নিকটে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে তিনি তার চাচাত ভাই ওরাকা বিন নওফেলের নিকটে গিয়ে সব খুলে বললেন। ওরাকা হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল পড়তে ও লিখতে পারতেন। তিনি বললেন, এই সেই দূত, যিনি মূসা (আঃ)-এর নিকটে ওহী নিয়ে এসেছিলে। হায়, আমি যদি সেই সময় বেঁচে থাকতাম, যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দিবে। আর যদি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব। এর কিছু কাল পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২২৭] এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের সূচনা হয় এবং দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ পবিত্র কুরআন নাযিল হতে থাকে।

লাইলাতুল মি'রাজ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বশরীরে বায়তুল্লাহ্ হতে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং এখান থেকে ঊর্ধ্বালোকে ভ্রমণ করেন। মি'রাজের তারিখ নিয়ে বিশেষ মতান্তর রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হল, ৬২১ খৃঃ মোতাবেক নবুওয়তের দশম বছর রজব মাসের ২৭ তারিখ রাতে মি'রাজ সংঘটিত হয়।[২২৮] অর্থাৎ ২৬ শে রজব দিবাগত রাতে। অথচ ২৭ শে রজব দিবাগত রাতে মি'রাজ হয়ে ছিল বলে এ উপমহাদেশে 'শবে মেরাজ' উদযাপন করা হয়। যা নিতান্তই দলীল বিহীন।[২২৯]

---

২১৭. আর-রাহিকুল মাখতূম, পৃঃ ৮৩।
২১৮. ইবনে হিশাম ১/১৯০ পৃঃ ।
২১৯. মাসিক মদীনা, পৃঃ ১২৩।
২২০. আর-রাহিকুল মাখতূম, পৃঃ ১৪৪।
২২১. অর্থবেদ, মন্ডল : ২০; সূক্ত : ১২০; মন্ত্র : ২।
২২২. মাসিক মদীনা, পৃঃ ১২৩।
২২৩. মাসিক মদীনা, পৃঃ ১২৪।
২২৪. আর-রাহিকুল মাখতূম, পৃঃ ৯০।
২২৫. ফাৎহুল বারী ১/২৭ পৃঃ, আর-রাহিকুল মাখতূম, পৃঃ ৯১।
২২৬. রহমাতুল্লিল আলামিন ১/৩৭ পৃঃ।
২২৭. আর-রাহিকুল মাখতূম, পৃঃ ৯১।
২২৮. রহমাতুল্লিল আলামিন ১/৫৯ পৃঃ।
২২৯. আত-তাহরীক, প্রবন্ধ : লাইলাতুল মি'রাজ : করণীয় ও বর্জনীয়, শেখ আব্দুছ ছামাদ, ১৪ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা,জুন ২০১১,পৃঃ ৩৫।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মক্কা মুকাররামা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাত্রীকালীন এ সফর বোরাক্ব[২৩০] যোগে সংঘটিত হয় এবং সেখান থেকে রফ্‌রফ্ নামক সবুজ রঙের গদি বিশিষ্ট পাল্কীতে চড়ে সিদরাতুর মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছে যান। মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহান আল্লাহ্‌র নূর দেখে ছিলেন[২৩১] জিবরীল (আঃ), জান্নাত, জাহান্নাম, মাক্বামে মাহমূদ, হাউযে কাউছার ইত্যাদি স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য তুহফা হিসাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়ে ফিরে আসেন।[২৩২] আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন? তিনি বললেন, না, বরং আমি জিবরীল (আঃ)-কে নীচে আবতরণ করতে দেখেছি।[২৩৩]

লাইলাতুল মে'রাজ সম্পর্কে F.R.Kurishi রচিত গ্রন্থ The Religion of Humanity-তে বলেন, Jagate guru will have a horse or ridding which he will fly over the earth and sevsn Heavens. অর্থাৎ 'জগৎ গুরু (মুহাম্মাদ) এক বিশেষ অশ্বে আরোহন পূর্বক পৃথিবী ও সপ্তাকাশ পরিভ্রমণ করেন'।[২৩৪] অন্যত্র ভাগবত পুরানে বলা হয়েছে,

অশ্ব মাশুগমারুহ্য দেবদত্ত জগৎপতি

অর্থ হল, জগৎ গুরু মুহাম্মাদ দেবতা জিবরীল কর্তৃক প্রদত্ত বেগবান অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহন করবেন।[২৩৫]

শেষ কথা :

এই উপমহাদেশে সর্ব প্রথম যে জাতির আগমন ঘটেছিল তারা যে ধর্ম বিশ্বাস এবং ধর্মগ্রন্থ নিয়ে এসেছে তা কোন এক নবী-রাসূলের দেখানো ধর্মমত ও কিতাব (ছহিফা) বলে অনুমিত হয়। নিশ্চয় তাদের অন্তরে ছিল যে কোন ধর্ম বিশ্বাস, হোক তা একেশ্বরবাদ কিংবা একাধিকেশ্বরবাদ। পরবর্তীতে সেই জাতি নিজেদের খেয়াল খুশি মত ঐ কিতাব বিকৃত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সমস্ত নবী-রাসূল সৃষ্টিকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। মূর্তি পূজাসহ সকল অংশীদারিত্ব থেকে মানব জাতিকে একেশ্বরবাদের দিকে সর্বদা ডেকেছেন এবং প্রতিফল দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অথচ হিন্দুরা আজও প্রতিমা পূজায় বিশ্বাসী, যা তাদের ধর্ম শাস্ত্রের ঘোর বিরোধী। 'একাম এবাদ্বিতীয়ম'। অর্থাৎ 'তিনি কেবল একজন ও অদ্বিতীয়'।[২৩৬] অন্যত্র 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। অর্থাৎ 'বিশ্ব প্রতিপালক এক, তিনি ব্যতীত কেহ নেই'।[২৩৭] 'না তছ্য প্রতিমা অস্তি'। অর্থাৎ 'স্রষ্টার কোন প্রতিমা নেই'।[২৩৮] অন্যত্র 'নৈনাম উর্ধভাব না তির্যনকাম না মধ্যে না পরিজাগ্রভাত না তস্য প্রাতিমে অস্তি যস্য নম মহত ইয়াছা'। অর্থাৎ তাঁর কোন প্রতিকৃতি নেই এবং তাঁর নাম মহিমান্বিত।[২৩৯] 'মা চিদান্যদভি শাংসত'। অর্থাৎ 'স্রষ্টার সাথে কাউকে শরীক করে ডেকো না বা অংশীদার কর না'।[২৪০]

অন্যদিকে তাদের ধর্মশাস্ত্র বেদ-পুরানে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং কল্কি অবতার বা শেষ নবী, নরাশংস মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব ও তার সার্বিক আচরণবিধি সম্পর্কে উপরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ বর্ণনা ও রচনা কোন জ্যোতিষি বা মনীষীর নয়। বরং বলা যায় এগুলো মহান আল্লাহ্‌র জানিয়ে দেয়া এলাহী বাণী। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ 'বরং 'তিনি হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল ও সর্বশেষ নবী' *(আহযাব ৩৩/৪০)*। সকল মতাদর্শের (ধর্মের) উপর একে (ইসলাম) বিজয়ী করার জন্য পাঠানো হয়েছে; যদিও মুশরিকরা একে অপসন্দ করে *(ছফ ৩৭/৯)*। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা *(সাবা ৩৪/২৮)*। আমরা পৃথিবীর সকল মানুষ শেষ নবীর জীবনাদর্শে জীবন পরিচালনা করি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ يَتَّبِعَنِى 'যদি আজ মূসা বেঁচে থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর কোন উপায় থাকত না'।[২৪১]

আর পৃথিবীতে যতগুলো ধর্মমত রয়েছে তন্মধ্যে ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, বাকী সকল ধর্মই বাতিল। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ 'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। আল্লাহ তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে তোমাদের রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও সমস্ত মানব জাতির জন্য' *(হজ্জ ২২/৭৮)*। উক্ত আলোচনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল, পৃথিবীর যত ধর্মমত তা কালের প্রেক্ষাপটে সত্য। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সামনে যে ইসলাম তা পূর্বের সকল ধর্মমতকে রহিত করেছে। বিধায় আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে শান্তির ধর্ম ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন-আমীন!!

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী ।]

২৩০.(বোরাক্ব) আরবী শব্দ, যা বা-রা-ক্বাফ মূল ধাতু। এর অর্থ বিদ্যুৎ। এটি বিদ্যুতের মত অতিব দ্রুতগতি সম্পন্ন ডানাওয়ালা অশ্ব বিশেষ। এটি খচ্চরের চেয়ে ছোট ও গাধার চেয়ে বড়, কর্ণদ্বয় চিকন ও গায়ের রং ধবধবে সাদা। বোরাক্বে চড়ে ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে দেখতে যেতেন, তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৪০৮ পৃঃ।

২৩১. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯, 'আল্লাহ্‌র দর্শন' অনুচ্ছেদ।

২৩২. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৫।

২৩৩. ফাৎহুল বারী ৮/৪৯৩ পৃঃ।

২৩৪. মাসিক মদীনা, পৃঃ ১২২।

২৩৫. ভাগবত পুরানঃ স্কন্ধ-১২: অধ্যায়-২: শ্লোক-৯।

২৩৬. চান্দোগ্য উপনিষদ, অধ্যায় : ৬, সেকশন : ২, ভলিউম : ১।

২৩৭. ঋগ্বেদ, পুস্তক : ১০, স্তুতিস্তাবক : ১১৪, ধারা : ৫।

২৩৮. যজুরবেদ, অধ্যায় : ৩২, অনুচ্ছেদ : ৩; ঋগ্বেদ, পুস্তক : ১, স্তুতিস্তাবক : ১৬৪, ধারা : ৪৬ এবং শ্বেতাস্বতরা উপনিষদ, অধ্যায় : ৬, অনুচ্ছেদ : ৯, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৬৩।

২৩৯. The Principal Upanishad by S. Radhakrishnan, pg. 736-737 & Sacred Books of East, Volume 15, The Upanishad part 02 page no. 253.

২৪০. ঋগ্বেদ, পুস্তক : ৮, স্তুতিস্তাবক : ১, ধারা : ১।

২৪১. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৭৭, সনদ হাসান।

ইসলাম ও কুসংস্কার

-নাফিসা বিনতে জালাল (জাদীদা)

ভূমিকা :

ইসলাম ও কুসংস্কার পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে যেখানে ইসলাম নেই, সেখানে অবশ্যই কুসংস্কার আছে। আর যেখানে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম আছে সেখানে কুসংস্কার নেই। মূলতঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবদের সংস্কারের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের পরশ পেয়েই কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব মূর্খরা সংস্কৃত হয়ে বিশুদ্ধ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। ঘুচে গেছে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের যাবতীয় কুয়াশাচ্ছন্ন বিভ্রান্তকারী অন্ধকার। তারা পথ দেখেছে সত্য ও বাস্তবের এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের। ইসলামের উজ্জ্বল আলোয় তারা নিজেরা যেমন আলোকিত হয়েছে তেমনি সারা জগতকেও আলোকিত করেছে। সেই সূত্র ধরেই বাংলাদেশেও ইসলামের আলো এসে পড়েছে। কিন্তু এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম জনগণ কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অজস্র কুসংস্কারের মধ্যেই বাংলাদেশী মুসলিমদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে। কুসংস্কার ভিন্ন যেন তাদের কোন গতি নেই। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বাঙ্গালী মুসলিমদের জীবনাচরণ থেকে নেয়া; শিরক যুক্ত কুসংস্কারের তালিকা প্রদত্ত হল।

রোগ ও রোগের চিকিৎসা সম্পর্কিত কুসংস্কার :

এ দেশের মুসলিমদের মধ্যে রোগ-ব্যাধি নিয়ে নানা কুসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে। সব সমাজেই রোগ-শোক নিয়ে হয়তো কিছু না কিছু কুসংস্কার থাকে; কিন্তু আমাদের দেশে এর প্রভাব যেন একটু বেশি। এখানকার মুসলিমরা রোগের কার্যকারণ বা রোগ উৎপত্তির মূল উৎস খুঁজতে যায় না। প্রকৃত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তারা সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে রোগের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে থাকে। স্বাভাবিক চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন তা না করে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আবর্তে থেকে তারা এমন সব আচরণ করে, যা সত্যিই হাস্যকর বলেই প্রতীয়মান হয়। যেমন-

(১) সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিবে এই আশংকায় স্ত্রী গর্ভবতী থাকাবস্থায় গরু বা ছাগল যবাই করা থেকে বিরত থাকে।

(২) জমজ কলা খেলে জোড়া বাচ্চা হবে বলে ধারণা করা।

(৩) পেট ব্যথা হলে তা নিবারিত হওয়ার আশায় বিরিয়ানী রান্না করে তিন রাস্তার মাথায় একটি পাত্রের মাঝে কিছু খাবার রেখে আসা।

বিবাহ সম্পর্কিত কুসংকার :

বিবাহ মানব সমাজের একটি অতি প্রাচীনতম প্রথা। এর মাধ্যমেই পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত। কিন্তু কালের আবর্তে এ বিবাহকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানাবিধ ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি ও কুসংস্কার। এজন্যই পবিত্র বিয়ে আজ বিধর্মীদের নানা শিরকযুক্ত কুসংস্কারে ভরে গেছে। যেমন-

১. বাংলা বর্ষ পঞ্জিকার বর্ণনানুযায়ী সপ্তাহের শনিবার, মঙ্গলবার ও অমাবস্যার দিনকে অশুভ মনে করে এ দিনগুলোতে কোন বিবাহ অনুষ্ঠান না করা।

২. অনেকেই পৌষ মাসে বিয়ে করে না। এ মাসের বিয়েতে নাকি মা-বাবার অমঙ্গল হয়। পৌষ মাসকে মনে করা হয় পোড়া মাস। তাই এ মাসে বিয়ে হলে নাকি সুখ-সম্পদ সব পুড়ে যায়।

৩. অনেকেই জন্মগ্রহণের মাসে বিয়ে করে না, তাতে নাকি অমঙ্গল হয়।

৪. বিয়ের দিন বৃষ্টি হলে নাকি কনের বাবার অমঙ্গল হয় আর বরের বাবার মঙ্গল হয় এবং এটা নববধূর জন্য একটা সুলক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। বিয়েতে বৃষ্টি হলে নাকি মেয়ে বাপের সব রস (সম্পত্তি) নিয়ে যায় স্বামীর ঘরে। পোড়া খাবার খেলেই নাকি বিয়েতে বৃষ্টি হয়। সে কারণে কুমারী কন্যাকে বাবা-মা পোড়া ভাত খেতে দেয় না।

৫. দাম্পত্য দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কেউ কেউ বরের বাড়ী প্রবেশ করার আগেই সেই বাড়ীর চৌকাঠে রশি বেঁধে দিয়ে আসে। এ কাজ করলে নাকি স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন দীর্ঘদীন অটুট থাকে।

৬. অনেকে গর্ভবতী নারীকে ভরদুপুর ও সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হতে দেয় না। তাদের মতে ঐ সময়ে বাইরে গেলে অকল্যাণ হয়। গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা হতে পারে নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ কিংবা ধরতে পারে জিন-ভুতে।

৭. বন্ধ্যা মেয়েলোক দেখলে নানা অকল্যাণ হয়, এমন অদ্ভূত ধারণা আমাদের অনেকের আছে। আমরা মনে করি, তাতে আমাদের যাত্রা শুভ হয় না বা কার্যসিদ্ধি হয় না। অনেকে বন্ধ্যা মেয়েলোকের কোলে নিজের সন্তান দিতে চায় না। কারণ তাতে সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে। আবার বন্ধ্যা নারীকে অন্য কোন নারীর বিয়ের দিন দেখতে দেয় না। এ ভয়ে যে, ঐ নারীও বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

৮. নবজাতক সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার রয়েছে। সন্তান গর্ভে এলে, জন্মকালীন সময়ে অথবা জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই যদি ঘটনাক্রমে কারও কোন রকম ধনপ্রাপ্তি ঘটে, তখন বলা হয়, এই মেয়ে বা ছেলে লক্ষী। লক্ষী হল হিন্দুদের ধন বা সৌভাগ্যের দেবী। ধন দেখে মুসলিমগণ ভাবে হিন্দুদের দেবী লক্ষী তাদের প্রিয় সন্তানের প্রতিমূর্তিতে এসে হাযির হয়েছে। আর এ সব অবস্থায় দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে বলা হয়, এই ছেলে বা মেয়ে অলক্ষী। এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা নতুন বউ নিয়েও হয়ে থাকে। 'স্ত্রী-ভাগ্য ধন' কথাটার প্রচলন এ কুসংস্কার থেকেই হয়েছে।

শষ্য বা ফল সম্পর্কিত কুসংস্কার :

কোন শষ্য বা ফলফলাদির গাছ রোপনের সাথে জড়িত হয়েছে শিরকযুক্ত নানা কুসংস্কার, যা আমাদের গ্রামীণ জীবনের সাথে মিশে আছে। যেমন-

১. সোমবার ও শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিন কৃষিকাজ আরম্ভ করলে ভাল ফলন হয় না বলে মনে করা।

২. কলার চারা রোপনের পূর্বে ঘরের আঙ্গিনা অতিক্রম করলে কলার ফলন ভাল হয় বলে মনে করা।

৩. কলার চারা রোপনের মুহূর্তে রোপনকারীর মাথায় বেশি ছেলে-মেয়ে হাত রাখলে কলার ফলন ভাল হয় অর্থাৎ কলার কাঁদিতে বেশি কলা হয় বলে ধারণা করা।

৪. কোন কলাগাছের কাঁদি সঠিক ভাবে বের না হলে গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসবের সময় সমস্যা হবার আশঙ্কায় তাকে সে কাঁদির কলা খেতে না দেয়া।

৫. কাঁচা মরিচের চারা লাগিয়ে উক্ত হাতে আগুনের তাপ নেওয়া এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, এতে কাঁচা মরিচ অধিক ঝাল হবে।

৬. হালুয়া বা মিষ্টি খেয়ে কুমড়ার বীজ বপন করলে এতে কুমড়া মিষ্টি বেশি হয় বলে ধারণা করা।

যাত্রাপথের সাথে সম্পর্কিত কুসংস্কার :

অনেকে ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় নানা ধরনের কুসংস্কার মেনে চলে। যেমন-

১. যাত্রা পথে পিছন থেকে কেউ ডাকলে খারাপ মনে করা।
২. যাত্রার সময় বিজাতী হিন্দু, খ্রীষ্টান ইত্যাদির মুখ দর্শন করলে অমঙ্গল হয়।
৩. যাত্রার সময় কারও বাসিমুখ দেখলে অযাত্রা হয়।
৪. যাত্রাকালে কিছুতে হোঁচট খেলে অমঙ্গল হয়। আপনজনেরা তখন যেতে দেয় না। একটু দাঁড়াতে বলে এবং তারপর কিছুক্ষণ বসে যেতে বলে।
৫. যাত্রা পথে ঝাড়ু দেখলে, কালো বা খালি কলসি দেখলে, কাক বা অন্য কিছু ডাকলে কিংবা বিড়াল দেখলে অশুভ আলামত বলে ধারণা করে।
৬. যাত্রার মুহূর্তে কেউ কারো সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না এ ধারণা বিশ্বাস করা।
৭. ভ্রমণের সময় রাস্তায় কোন বিধবা মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হলে বিপদের ভয়ে ভ্রমণ বাতিল করা।
৮. ভ্রমণের প্রাক্কালে গাভী বা কুকুর হাঁচি দিলে এতে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা করা বা নির্ঘাত মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে বলে বিশ্বাস করা ।
৯. ভ্রমণের প্রাক্কালে বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বের হওয়াকে অশুভ বলে মনে করা ।
১০. কোন ভাল কাজের উদ্দেশ্যে বের হলে অকল্যাণ হতে পারে এ ভয়ে পিছনের দিকে ফিরে না তাকানো ।
১১. কোথাও যাওয়ার সময় শিয়াল, কুকুর বা বনবিড়াল ডান দিক হতে বামে গেলে যাত্রা অশুভ, আর বাম দিক হতে ডান দিকে গেলে যাত্রা শুভ বলে মনে করা ।
১২. ভ্রমণের সময় বা অন্য সময় পেঁচা দেখলে বা এর আওয়াজ শুনলে এটাকে অশুভ মনে করা এবং ঘর-বাড়ি বিরান হয়ে যাবে বলে ধারণা করা ।

রাতে ও দিনের সাথে সম্পর্কিত কুসংস্কার :

দিন ও রাতের বিভিন্ন মুহূর্ত বা সময় নিয়েও আমাদের সমাজে রয়েছে নানা বিভ্রান্তি, যার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. সূর্যোদয়ের পূর্বে গৃহবধূ ঘুম থেকে উঠে ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিয়ে ও বাসি হাঁড়ি-বাসন পরিষ্কার করে ঘরে পানি ছিটিয়ে দিলে ঘরে ভাগ্য লক্ষ্মীর আগমন ঘটে বলে বিশ্বাস করা।
২. সকাল বেলা দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকীতে কিছু বিক্রি করলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে বলে ধারণা করা।
৩. আছরের পর ঘর ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা।
৪. সন্ধ্যার আগে উঠান ও ঘর ঝাড়ু না দিলে সংসারে সব সময় দেনা লেগেই থাকে বলে বিশ্বাস করা।
৫. সন্ধ্যার সময় ঢেকিতে ধান ভাঙ্গালে গৃহ থেকে শান্তি চলে যায়। শিকায় ভাতের হাড়ি পাতিল ঝুলিয়ে রাখলে সংসারে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে বলে ধারণা করা।
৬. সন্ধ্যা বা রাত্রিতে লেনদেন করলে অমঙ্গল হয়।
৭. সন্ধ্যার আগে উঠান এবং ঝাড়ু দিলে সব সময় ধনী থাকতে হয়।
৮. সন্ধ্যার আগে উঠান এবং ঘর ঝাড়ু দিলে সব সময় ঋণী থাকতে হয়।
৯. রাতের বেলায় কাউকে টাকা দিলে এতে ভাগ্য খারাপ হবে বলে মনে করা।
১০. রাতের বেলা ঘরের চালে বসে পেঁচা ডাকলে বিপদের আশঙ্কা করা।
১১. গভীর রাতে পেঁচা বা ভরদুপুরে কাক ডাকলে বিপদের আশঙ্কা করা।
১২. রাতের বেলা ঘর হতে বাইরে কুলি ফেললে কিংবা কোন উচ্ছিষ্ট বা এঁটে পানি নিক্ষেপ করলে ঘর-ভিটা শূন্য হয়ে যাবে বলে মনে করা।
১৩. রাত্রিকালে একা একা ভ্রমণ করলে অন্তর কঠিন হয়ে যায়।
১৪. রাত্রে আয়না দেখলে রোগ (কঠিন পীড়া) হয় এবং চেহার নষ্ট হয়ে যায়।
১৫. রাতের বেলা ঝাড়ু দিলে আয় উন্নতি হয় না।
১৬. রাতে নখ কাটা ঠিক নয়।
১৭. চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক কোন কিছু কাটাকাটি করে তাহলে তার সন্তানের অঙ্গহানি ঘটে।
১৮.রাতে হাত-পায়ের আঙ্গুল ফুটালে দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় বলে মনে করা।
২৯. খাওয়ার পর বাসনপত্র ইত্যাদি না ধুলে মানুষ ধন হারায়।

সময় ও দিবস সম্পর্কিত কুসংস্কার :

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সময় ও দিনক্ষণের ভালমন্দে বিশ্বাসী। দিন ও মাস সংক্রান্ত কুসংস্কারগুলো হল :

১. শুক্র ও রবিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে ক্ষতি হবে।
২. শনি ও মঙ্গলবার ঝাটা বাঁধলে সংসারে অকল্যাণ ঘটে।
৩. শনি ও মঙ্গলবারে বিয়ে করা অশুভ।
৪. রবিবারে ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটালে তার বাঁশ ঝাড়ের জন্য অশুভ বলে বিশ্বাস করা।
৫. সোমবার ও বুধবারে গোলা হতে ধান বের করা যায় না
৬. জন্মদিনে বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মধুর হয় না।
৭. মুহার্‌রম, কার্তিক প্রভৃতি মাসে বিয়ে শাদী করা অশুভ।
৮. বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে দোকানে মাল বাকী বিক্রি করাকে অশুভ মনে করা।
৯. আষাঢ় মাসের সাড়ে সাত দিন হলে আমাবতি বলে মান্য করতে হয় ও চাষাবাদ করা যায় না ।
১০. মুসলিম গৃহস্থলির অনেকেই পৌষ মাসে তাদের ধানের গোলায় হাত দেয় না। কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ সময়ে গোলা থেকে ধান সরালে নাকি ধন-সম্পদ ফুরিয়ে যায় ।
১১. নতুন বউকে ভাদ্র মাসে শ্বশুর বাড়ীতে রাখা হয় না ।
১২. ভাদ্র ও পৌষ মাসে মেয়ে লোকের সওয়ারী পাঠানো যায় না।
১৩. আশ্বিন মাস যাবার দিন মুটে বানিয়ে গরুকে গা ধৌত করা শুভ বলে মনে করা ও গো ফাল্গুন বলে মান্য করা ।
১৪. নববর্ষ এলে প্রথম দিন অনেকে ভাল খাবার খায় । তাদের ধারণা, পহেলা নববর্ষের প্রথম দিন যদি ভাল খাবার খায় তাহলে সারা বছরই ভাল খেতে পারবে । অন্যথা সারা বছরই খারাপ খেতে হবে ।

পশু পাখির সাথে সম্পৃক্ত কুসংস্কার :

১. কুকুর কাঁদলে রোগ বা মহামারী আসবে বলে মনে করা।
২. পৃথিবী একটা ষাড়ের শিংয়ের উপর রয়েছে, যখনই সে শিং নাড়া দেয় তখনই ভূমিকম্প হয় বলে বিশ্বাস করা ।
৩. কোন বিশেষ পাখি বা কাক ডাকলে এটাকে কোন মেহমান আগমনের পূর্বাভাস বলে মনে করা ।
৪. কাক ডাকলে কেউ মারা যাবে বলে বিশ্বাস করা ।
৫. চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে বলে মনে করা ।

৬. কোন প্রাণী বা কোন প্রাণীর ডাককে অশুভ বলে ধারণা করা।
৭. শিয়াল বা বনবিড়ালের ডাক শুনে বাজারের দর কম বেশি হয় বলে বিশ্বাস করা ।
৮. টিকটিকি ডাকলে সত্য সত্য বলে মাটিতে টোকা দেয়া।
৯. মাকড়সা গায়ে উঠলে নতুন পোশাক প্রাপ্তি ঘটে।
১০. পিঁপড়ার মাটি দ্বারা স্তনে প্রলেপ দিলে স্তনের বাত সেরে যায়।
১১. জোনাকী পোকা খাওয়ালে রাতকানা রোগ ভাল হয়।
১২. ঘরে মাকড়সার জাল থাকলে মানুষ গরীব হয়।
১৩. উকুন পেয়ে জীবিত ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী সম্পর্কিত কুসংস্কার :

১. কোন মহিলার প্রথম সন্তান মারা গেলে ঐ মহিলাকে অলক্ষ্মী ভেবে অন্য কোন মহিলার বিয়ের আসর দেখতে যেতে না দেওয়া। কারণ ঐ মহিলার কারণে এ নারীরও প্রথম সন্তান মারা যাবে।

২. লক্ষ্মী হারানোর আশংকায় বাসী (অর্থাৎ সকালবেলা চুলা ঝাড়ু দেয়ার আগেই) চুলার ছাই কাউকে নিতে না দেওয়া।

৩. বাড়ির খাদ্যদ্রব্যের লক্ষ্মী চলে যাওয়া এবং মৃত আপনজনদের রূহের উপর পানি পড়ে যাওয়ার ভয়ে রাতের বেলা ঘরের অব্যবহৃত পানি বাইরে নিক্ষেপ না করা।

৪. গালে হাত দিয়ে বসলে ঘরে/পরিবারে অলক্ষ্মী আসে বলে ধারণা করা।
৫. বড় গ্রাসে খানা খেলে লক্ষ্মী ভয় পেয়ে যায় বলে ধারণা করা।
৬. ঘরের চালা হতে খড় নিয়ে খেলা করলে অলক্ষ্মী আসে বলে ধারণা করা।
৭. অনেকেই হিন্দুদের মত লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীতে বিশ্বাস করে ব্যক্তি বা তার কোন কাজের সাথে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা। এজন্য বিয়ে বাড়িতে দেবী লক্ষ্মীর পায়ের আলপনা আঁকে যেন এই পায়ের ছাপে পা ফেলে ঘরে লক্ষ্মী আসে।
৮. ভাঙ্গা বাসনে খাওয়া-দাওয়া করলে অলক্ষ্মী ঘরে আসে।
৯. ভাঙ্গা হাঁড়িতে রান্না করলে এবং ভাঙ্গা বাসনে খেলে অলক্ষ্মী আসার কারণে তাড়াতাড়ি সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে বলে ধারণা করা।
১০. ঘরের বেড়ায়/দেওয়ালে কিংবা দরজার সামনে পানের পিক ফেললে ঘরে অলক্ষ্মী এসে বাসা বাঁধে বলে ধারণা করা।
১১. ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘরের দরজায় ময়লা ফেললে, ঘরের দরজায় কুলি ফেললে ঘরের লক্ষ্মী চলে যায় ও সংসারে বিশৃংখলা হয় বলে ধারণা করা।

১২. সরাসরি চুলা থেকে খেলে বা ঘরের দরজায় বসে খেলে লক্ষ্মী চলে যাবে বলে বিশ্বাস করা।

লক্ষ্মী হিন্দুদের এক দেবতা :

হিন্দু ধর্ম মতে, লক্ষ্মী হল বিষ্ণুপত্নী। তিনি ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী । তিনি কমলা, রমা, সৌভাগ্য, শোভা, ইন্দিরা, পদ্মা, পদ্মালয়া প্রভৃতি নামেও হিন্দুরা লক্ষ্মীকে সম্বোধন করে থাকে। লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা। প্যাঁচা তো অশুভের প্রতীক। সমীকরণটা তাহলে কিভাবে হল?

হিন্দুদের মতে, লক্ষ্মীর সুনযরে যারা আছেন, তারা হয় সৎ, শান্ত, সুবোধ ও ধনবান। আর যাদের ওপর লক্ষ্মীর সুনযর নেই অথবা লক্ষ্মী যাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তারা হয় হতভাগা, দুষ্ট, দরিদ্র এবং অশান্ত। এ হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্রীয় বিশ্বাস।

পর্যালোচনা :

সুধী পাঠক! হিন্দুদের এই শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আমরা মুসলিমরা কি লক্ষ্মীকে দেবতা মেনে তার নাম সব সময় জপ করতে পারি? লক্ষ্মীর নাম কি আমরা উপমায় আনতে পারি? যদি আনি, তাহলে আমাদের ঈমান থাকছে কোথায়? হিন্দুরা লক্ষ্মীর পূজা করে। দূর্গাপূজার অব্যবহিত পরেই তাকে হিন্দুরা লক্ষ্মী-পূর্ণিমা বলে থাকে। মুসলিমরা লক্ষ্মীপূজা করে না, লক্ষ্মী-পূর্ণিমার অনুষ্ঠান ও করে না, কিন্তু লক্ষ্মীর নাম প্রায়ই মুখে নিয়ে ঈমানের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখে।

একজন মুসলিমের স্ত্রী অবশ্যই মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর সন্তান ও মুসলিম। যদি তাই হয়, তাহলে তাদের ছেলে-মেয়ে কেমন করে লক্ষ্মী ছেলে আর লক্ষ্মী মেয়ে হয়? মুসলিমের ছেলে-মেয়েরা তাদের মা-বাবাকে লক্ষ্মী মা বা লক্ষ্মী বাবা কেমন করে বলতে পারে? পরিবারে পারস্পরিক সম্বোধন ভাষা যদি এই হয়, তাহলে তাদের ছেলে-মেয়ে কিভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসারী হবে? যেখানে লক্ষ্মী সেখানে হিন্দু ধর্ম, সেই সংস্কৃতি, সেই কৃষ্টি, সেই ধর্মের আমেজ ও মেজাজ থাকবেই। যেখানে লক্ষ্মী সেখানে আল্লাহ্র রহমত বর্ষণ হতে পারে না। লক্ষ্মীর জায়গায় লক্ষ্মী আছে এবং থাকবেও তাদের জন্য, যাদের কাছে সে পূজিত। আমরা কেন তাকে নিয়ে টানাটানি করি? সে তো আমাদের নয়। আমাদের ছেলে-মেয়েদের জীবন ও চরিত্র আর তাক্বদীরকে সুন্দর, বরকতময়, পবিত্র ও রহমতের বারিধারায় সিক্ত করার মত সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন আছেন, তখন কেন বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হই? লক্ষ্মী তো নিজেই স্বাধীন নয়, সে অন্যের স্ত্রী, তিনি কতটুকু আমাদের দিতে পারে?

সর্বশক্তিমান আল্লাহ চান তাঁর স্মরণ, তাঁর ইবাদাত, তাঁর কাছে আত্মসমর্পিত বান্দার হৃদয়, তিনি চান করুণার কাঙ্গালদের। তাঁকে ছেড়ে কেন আমরা বিষ্ণুর স্ত্রীকে সৌভাগ্যের মালিক মনে করি? কেন আমরা লক্ষ্মীর নাম জপ করি? এমন আত্মভোলা ও পরের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি অনুরুক্তদের নাম যতই ইসলামী হোক না কেন, ওরা শুধু জাহেল মূর্খই নয়, ওরা মুনাফিক এবং ইসলামের দুশমন। ওরা লক্ষ্মীর অনুসারী, আল্লাহ্র রহমত পাবার অযোগ্য। যারা না জেনে, বেখেয়ালে লক্ষ্মীকে কথায় ও লেখায় আনেন, তাদের তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্মী পূজা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন-সম্পদ সম্পর্কিত কুসংস্কার :

বর্তমান মুসলিম সমাজে অভাব-দারিদ্রতা, সম্পদ কিংবা টাকা-পয়সা হারানোর ব্যাপারে অসংখ্য কুসংস্কার রয়েছে। যেমন-

১. খাওয়ার পর মাথায় হাত ঘষলে আয় কমে যায়।
২. দাঁত দিয়ে নখ কাটলে উন্নতি করা যায় না।
৩. ছেঁড়া জামা-কাপড় বা ভিজা কাপড় গায়ে পরা অবস্থায় সেলাই করলে টাকা হারায়।
৪. খাওয়ার পর পরনের কাপড় দিয়ে মুখ মুছলে অভাব দূর হয় না।
৫. গবাদি পশুকে লাথি মারলে জীবনে অমঙ্গল হয়।
৬. রাতের বেলা এঁটে পানি বা উচ্ছিষ্ট বাইরে ফেললে দারিদ্রতা আসে।
৭. হেঁটে হেঁটে দাঁত মাজলে সম্পদ চলে যায়।
৮. গামছায় বেঁধে বাজারে সওদা আনলে অভাব চিরকাল থেকে যায়।
৯. কুলায় লাথি মারলে ক্ষেতের ফসল কমে যায়।

১০. বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নতুন বউয়ের পিতার বাড়ী থেকে শাড়ীর আঁচলে বেঁধে কিছু চাউল এনে তা স্বামীর বাড়ীর গুদামে ছিটিয়ে দেওয়া।

১১. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশি হলে ঐ ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবে বলে ধারণা করা।

১২. ভোঁতা দা, কাস্তে ও যন্ত্রপাতি দ্বারা কাজ করলে সবসময় দেনা লেগে থাকে বলে মনে করা।

১৩. নাক ও কপালে ফোঁড়া হলে নাকি ধন আসে।

১৪. কপালের উপর হাত রেখে ঘুমালে নাকি অমঙ্গল হয়।

১৫. স্বামীর নাম মুখে নিলে অমঙ্গল হয়।

১৬. ছেঁড়া কাপড় ঘরে রাখলে সম্পদ হারিয়ে যায়।

১৭. ভাঙ্গা পাতিলে রান্না করলে মানুষ গরীব হয়ে যায়।

১৮. ঘর ঝাড়ু দিয়ে আবর্জনা ঘরে রেখে দিলে সম্পদ হারায়।

গরীব হওয়ার আরও কিছু কারণ সম্পর্কিত কুসংস্কার :

১. হাত না ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে।
২. ফুঁ দিয়ে বাতি নিভালে।
৩. ভাঙ্গা চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়ালে।
৪. সন্ধ্যায় ঘরে আলো না জ্বালালে।
৫. ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে বসলে।
৬. হাঁটতে হাঁটতে দাঁত খেলাল করলে।
৭. হেঁটে হেঁটে খাদ্য খেলে মানুষ গরীব হয়।
৮. বুধবার ও রবিবার রাত্রে স্ত্রী-সহবাস করলে।
৯. পুকুরে পেশাব করলে মানুষ গরীব হয়।
১০. উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে।
১১. খালি মাথায় আহার করলে।
১২. বিনা দাওয়াতে কারো বাড়ীতে আহার করলে।
১৩. কাপড় দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করলে।
১৪. খারাপ কথা বলে সম্মানী লোকের মান নষ্ট করলে।
১৫. পরিবারের স্ত্রীলোককে বেপর্দায় রাখলে।
১৬. ফলবান বৃক্ষের নীচে পায়খানা পেশাব করলে।

আরও কিছু কুসংস্কার :

(১) নবজাতকের মুখে বা দেহের অন্যত্র চর্মরোগ জাতীয় গোটাগোটি হলে এ সবকে মানুষ মুখ দোষের গোটা বলে। আসলে বাচ্চাদের নানা রকম চর্মরোগ হয়।

পর্যালোচনা : উক্ত রোগ কারও চোখের দৃষ্টি বা মুখদোষের কারণে হয় না। গ্রীষ্মকালে এ সব অসুখ বেশি দেখা দেয়। হাম ইত্যাদি জাতীয় অসুখ বাচ্চাদের হয়েই থাকে। টিকা দিলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আর সে সব হয় না। যেসব বাচ্চার চেহারা সুন্দর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে সে সব বাচ্চার মায়েরা মুখদোষ বা অশুভদৃষ্টি থেকে বাচ্চা রক্ষা করার জন্য কপালের পাশে মাথার একটি বড় কাজলে ফোঁটা দিয়ে রাখে। প্রশ্ন হল, মুখদোষ বা দৃষ্টিদোষ কি কেবল ছোটদের লাগে? সেটা তো বড়দেরও লাগতে পারে। তাহলে বাচ্চার মাকে আগে লাগাতে হয় ফোঁটা। কারণ তার দিকেই তো মানুষ বেশি আগ্রহ নিয়ে তাকাবে। আবার অনেকেই অন্যদের দৃষ্টির আড়াল করে রাখে বাচ্চাদের।

(২) মাথা ব্যাথা হলে সূর্যকে সালাম জানালে নাকি তা সেরে যায়।

পর্যালোচনা : সূর্যকে নমস্কার জানায় হিন্দুরা। তারা সূর্যকে দেবতা মনে করে এবং সূর্য দেবতা উদয়ের দিকে মুখ করে উপাসনা করে। এ কারণে সূর্যকে নমস্কার জানালে হয়তো হিন্দুদের মাথা ব্যাথা, পেট ব্যাথা, কোমর ব্যাথাপ্রভৃতি ভাল হতে পারে। কিন্তু মুসলমানের কোনটাই হবে না।

৩. অনেকেই পেটের পীড়ায় অমলিশ সেবন করে। পেটে আম বেড়ে গেলে বা আমাশয় দেখা দিলে অমলিশ খায়। লতার নামে এবং অসুখের নামে কিছুটা মিল থাকায় এ ব্যবস্থা। আবার ফুলা রোগে অর্থাৎ শরীরে পানি জমে গেলে পানিতে জন্মানো ঠোঁয়াশ লতা সেবন করা হয়।

পর্যালোচনা : ঠোঁয়াশ লতা বেশ ফোলা ফোলা। ভিতরটা ফাঁপা। এ জন্যই ফুলা রোগে ফুলা ঠোঁয়াশের ব্যবহার।

৪. কুকুরে কামড় দিলে কাঁসার থালা পড়ে দেওয়া হয়। এটা মন্ত্র পড়ে আক্রান্ত রোগীর পিঠে ঘষা হয়। থালা পিঠে দিলে আটকায়, বুঝা যায় বিষ আছে আর যদি থালা গড়িয়ে পড়ে যায় তাহলে ধরা হয় আর বিষ নেই।

পর্যালোচনা : পাগলা কুকুরের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয় আর এ ভয়ঙ্কর বিষয়টির এমন উদ্ভট চিকিৎসা সত্যিই বিপদজনক।

৫. অনেকেই গরু বা মহিষের মাথায় খুলি কিংবা চোয়াল ঘরের কোণায় বা ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে। তাদের বিশ্বাস এর ফলে বাড়িতে জিন, ভূত, পেত্নি প্রভৃতির আছর হবে না। মুসলিমদের মধ্যে এমন একটা ধারণা রয়েছে যে, ভূত-প্রেতের মধ্যে অনেকেই হিন্দু আর এ হিন্দু ভূতেরা মুসলিমদের ওপর আছর করে। তাই তারা হিন্দু আর হিন্দু ভূতের থেকে মুসলিমদের বাঁচার উপায় ভেবে ভূতগুলোকে বাড়ি থেকে দূরে রাখার জন্য ঘরের কোণে বা চালে গরুর হাড় ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখে। জিনেরা গরু বা মহিষের হাড় দেখে পালাবে এ বিশ্বাস ঠিক নয়। কারণ পশুর হাড় জিন জাতির খাদ্যদ্রব্য হিসাবে নির্ধারিত। তাই মানুষের টাঙ্গানো হাড় জিনদের খাবারের স্থায়ী উৎসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং জিন তার খাবার সংগ্রহের জন্য ঐ সব বাড়ী ঘরে আসবেই।

৬. হিন্দু ধর্মে দেখা যায় যে, তারা দেবতার ভোগ দেয় আর মুসলিমরা দেয় পেত্নীর ভোগ। কোন মানত বা রোগ মুক্তির প্রত্যাশায় মানুষ কিছু খাবার সাধারণত দু-তিন রকমের একত্রে পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে দেয় অথবা কলাপাতায় করে তিনমুখো (তে-মাথা) পথের মোড়ে রেখে আসে সন্ধ্যা বেলায়। কারণ তাদের বিশ্বাস, পেত্নীরা রাতে আসে আর সেই খাদ্য যদি পেত্নী খায় তাহলে পেত্নীর দ্বারা যেসব অসুখ হয়, ভোগ দেওয়ার বদৌলতে সেসব অসুখ সেরে যাবে। বাংলাদেশী মুসলিমরা ঘুষ খায় আর পেত্নীরা খাবে না কেন? ঘুষ তো মূলতঃ পেত্নীর খাদ্য। ঘুষখোর এক ধরনের পেত্নী। যাহোক মুসলিমদের দেয়া ভোগ খেয়ে ফেলে কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ও অন্যান্য নিশাচর পাখিরা। এরাই তো মুসলিমদের না দেখা পেত্নী। কেউ কেউ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে কুল, ঝাড়ুর শলা, ডিম, চাউল-ভাঁজা প্রভৃতি একত্র করে পুকুরে ফেলে দেয়।

৭. কেউ খাবার খেতে দেখলে পেটের পীড়া হয়, এ ধারণা যেমন অনেকের আছে তেমনি অনেকের আবার এমন ধারনাও আছে যে, খাবার প্রস্তুতকালে বা মাছ-গোশত কাঁচা অবস্থায় অন্য কেউ দেখলে তার স্বাদ কমে যায়।

৮. অনেকের সন্তান হলে পরে মারা যায়। সন্তান হয়ে যাতে মারা না যায় সে জন্য জানের ছাদাক্বা হিসাবে তারা অদ্ভুত ব্যবস্থা নেয়। যেমন-তারা ছেলে সন্তান হলে কান ফুড়িয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গরু ছেড়ে দেয়। সন্তানের বাজে নাম রাখে। যেমন- হেঁজা, মরা, হাইড়গা (ষাঁড় অর্থে) প্রভৃতি। তাদের ধারণা এসব করলে সন্তান আর ছোট বেলায় মারা যাবে না।

৯. মালামাল চুরি গেলে লোকে চোর ধরার জন্য ও মালমাল উদ্ধারের জন্য নানান রকম তদবীর করে। এর মধ্যে রয়েছে পান পড়া, চিনি পড়া, বাটি চালান, বাঁশ চালান প্রভৃতি। আর এ গুলো

করতে হয় তুলোরাশির লোকদের নিয়ে। অন্যথা বাটি ঘুরবে না, বাঁশ ছুটবে না, আয়নায় চোখ দেখা যাবে না। আসলে এ সবই ভণ্ড ওঝাদের ভেল্কিবাজি মাত্র। এর মত মিথ্যা আর কিছু নেই।

১০. অনেকের ধারণা কানে কচু, নাভিতে তৈল আর পেটে তিতা দিলে রোগমুক্ত থাকা যায়। এটা একটা কুসংস্কারচ্ছন্ন ধারণা।

১১. যাদের সন্তান হয় না তাদের বিশ্বাস, তাবিয-কবয বা পীরের দরগায় নিয়ত-মানত করলে সন্তান হবে।

১২. আঙ্গুল দ্বারা খেলা করলে স্মরণশক্তি কমে।

১৩. মৃত ব্যক্তির কবরের উপর লিখিত স্মৃতিফলকের প্রতি তাকালে স্বাস্থ্য হানি ঘটে।

১৪. গোসলখানায় বসে থাকলে মানুষ দুর্বল হয়।

১৫. পশমী কাপড় পরিধান করলে মানুষ মোটা হয়।

১৬. গোলাপ পানি দ্বারা চুল ধৌত করলে বার্ধক্য বাড়ে।

১৭. পাথর দ্বারা খেলা করলে মানুষ নির্মম হয়।

১৮. দাঁড়িয়ে পায়জামা পরলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়।

১৯. চৈত্রমাসে ঝাঁটা বাঁধা হয় না, কেননা তাতে অমঙ্গল হয়।

২০. খাটো, চুলছোট, মোটা এবং হাতলম্বা মেয়ে বিয়ে করলে অমঙ্গল হয়।

২১. আক্বীকার গোশত সন্তানের পিতা-মাতা খেলে অমঙ্গল হয়।

২২. মেয়েদের কালো কাপড়ের পায়জামা ও ছায়া পরা ভাল নয়।

২৩. কুরবানীর পশুর রক্ত গায়ে মাখা এবং কাপড়ে মেখে দরজায় দরজায় ছোপ দেওয়া আর এটা দিয়ে তাবীয দেয়া মঙ্গলজনক।

২৪. মেয়েরা মাথার মাঝামাঝি না করে ডানে বা বামে সিঁথি করলে তাদের স্বামীরা পুলছিরাত পারি দিতে পারবে না।

২৫. স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪০ দিন যাবৎ রান্না করে না। কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ সময় রান্না করলে স্বামীর কবরে আযাব হবে।

২৬. হাতের তালু চুলকালে অর্থ-কড়ি আসবে বলে মনে করা।

২৭. চোখ লাফালে বিপদ আসবে বলে ধারণা করা।

২৮. বাম চক্ষু স্পন্দিত হলে সৌভাগ্য দেখা দেয়।

২৯. এক চিরুণীতে দু'জন চুল আঁচড়ালে ঐ দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লাগবে বলে বিশ্বাস করা।

৩০. ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ার ভয়ে বেলা ডোবার পর চিটাগুড়, হলুদ বিক্রি থেকে বিরত থাকা।

৩১. পৃথিবীকে একটা ব্যক্তি বা ফেরেশতা কাঁধের উপর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যখনই সে কাঁধ পরিবর্তন করে তখনই ভূমিকম্প হয় বলে ধারনা করা।

৩২. নতুন পোশাক পরিধান করার পর হাঁচি আসলে এটাকে অশুভ বলে মনে করা।

৩৩. জিহ্বায় বা ঠোঁটে কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে বা স্মরণ করছে বলে বিশ্বাস করা।

৩৪. কোন লোকের আলোচনা চলছে, ইতোমধ্যে বা কিছুক্ষণ পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণে বলে মনে করা।

৩৫. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চাও মারা যাবে বলে বিশ্বাস করা।

৩৬. পরীক্ষার শূন্য পাওয়ার ভয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকা।

৩৭. ঝাড়ুর আঘাত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে বা জ্বর আসবে বলে মনে করা।

৩৮. চিরুণী মাটিতে পড়লে বা বিড়ালের মুখ মোছা দেখলে অতিথি আসবে বলে মনে করা।

৩৯. ঝাড়ু উল্টা করে রাখা ঠিক নয় বলে ধারণা করা।

৪০. ভাঙ্গা চিরুণী দ্বারা মাথা আঁচড়ালে বুদ্ধি লোপ পায়।

৪১. ভাঙ্গা আয়না দিয়ে মুখ দেখলে খারাপ হয়।

৪২. ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে মনে শয়তানী বুদ্ধির উদ্রেক হয় বলে মনে করা।

৪৩. ভাঙ্গা ছাতা ব্যবহার করলে বিবেক লোপ পায়। গামছা বা গেঞ্জি সেলাই করে ব্যবহার করলে সম্মান নষ্ট হয় বলে মনে করা।

৪৪. ঘরের বেড়া ও খুঁটিতে কিংবা কোন গাছে পান খাওয়া চুন মুছলে ঘরে অশান্তি আসবে বলে বিশ্বাস করা।

৪৫. গোসল করে ভিজা কাপড় নিংড়ানো পানি পায়ে ফেললে স্ত্রী মারা যাবে বলে ধারণা করা।

৪৬. মাথার বালিশ পা দিয়ে সরালে বুদ্ধি বিগড়ে যায় বলে মনে করা।

৪৭. পানির কলসী ঢেকে না রাখলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মুহাব্বত চলে যায় বলে বিশ্বাস করা।

৪৮. মাতা-পিতা ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ের বিছানায় বসে খাদ্য খেলে সন্তানের অমঙ্গল হয় বলে মনে করা।

৪৯.ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ে কোলে নিয়ে খানা খেলে অকালে সন্তান মারা যায় বলে বিশ্বাস করা।

৫০. মেয়েদের নাকফুল হারালে স্বামীর অকল্যাণ হয় বলে বিশ্বাস করা।

৫১. বিবাহিত নারী তার নাকফুল এমনিতেই খুলে রাখলে স্বামীর হায়াত কমে যায় বলে ধারণা করা।

৫২. ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ের কোমরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অকালে স্বামী মারা যায়।

৫৩. পায়খানায় বসে ঘন ঘন থুথু ফেললে দাঁতে অসুখ হয় এবং অকালে দাঁত পড়ে যায়।

৫৪. জোনাকি পোকা হাতে নিলে পেটের পীড়া হয়।

৫৫. জামা উল্টা গায়ে দিলে ফিরনী খাওয়ার ভাগ্য হয়।

৫৬. ঝাটা জোরে মাটিতে পিটালে বংশের ক্ষতি হয়।

৫৭. বাড়ির প্রবেশ পথে পা ধুলে সংসার ধ্বংস হয়ে যায় ইত্যাদি।

অতএব সকল মুসলিমকে এ ধরনের বিশ্বাস হতে উদ্ভূত অনুভূতিকে পরিহার করতে বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে। এক্ষেত্রে অজ্ঞাতসারে যদি কেউ কোন কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, যা এ প্রকৃতির বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়ে নিম্নের দো'আ দ্বারা আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত। اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك *'আল্লাহুম্মা ত্বয়রা ইল্লা ত্বয়রুকা ওলা খায়রা ইল্লা খায়রুকা ওয়ালা ওয়ালা ইলাহ গয়রুকা'*।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার দেয়া শুভাশুভ ব্যতীত কোন শুভ বা অশুভ নেই আপনার কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহা নেই' *(আহমাদ, ২/২২০; হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৫/১০৫; আলবানী, সিলসিলাতুস ছহীহাহ, হাদীছ নং-১০৬৫; আত্ব-ত্বাবারানী। হাদীছটির সনদ ছহীহ।)*

শুভ-অশুভ আলামত বিষয়ে বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করা নিরর্থক। বৃহৎ শিরকের উৎসমূলে পরিণত হওয়ার আশংকায় ইসলাম এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। মূর্তি মানুষ, তারা, সূর্য ইত্যাদি পূজার উৎপত্তি হঠাৎ করে হয়নি। এ ধরনের পৌত্তলিকতার চর্চা দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমান্বয়ে বিকাশমান হয়েছে। বৃহৎ শিরকের শিকড় যত বিস্তার লাভ করে, আল্লাহ্র একত্বের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে থাকে। এভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধ্বংস করার পূর্বেই তা সমূলে উৎখাত করতে ইসলাম সর্বদা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

[লেখিকা : গোবিন্দা, পাবনা]

শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানীর সাথে সাক্ষাৎ

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

৫ জুন ২০১৪। তাপদগ্ধ গ্রীষ্মের আরো একটি দিনের শেষ বিকেল। কারেন্ট চলে যাওয়ায় হোস্টেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যের নরম আলোয় মোড়া মারগালা পাহাড়ের বৈকালিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম আর আফগানী ও চীনা দুই বন্ধুর সাথে গল্প করছিলাম। হঠাৎ মোবাইলে রিং বেজে উঠল। অপরিচিত নাম্বার। পাকিস্তানে আসা থেকে আমার সরব ফোনটা একেবারে নীরব হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কর্মহীন ফোনটা হঠাৎ জেগে উঠলে বিশেষ কিছুই মনে হয়। তার উপর অপরিচিত নাম্বার। বেশ আগ্রহ নিয়ে রিসিভ করলাম কলটা। ওপার থেকে বেশ ভারী কণ্ঠের আওয়াজ, 'মে আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী বোল রাহা হুঁ'।

–'জি! শায়খ নাছের রহমানী! সুবহানাল্লাহ! শায়খ, আখের মে ম্যায় আপ সে বাত কার রাহা হুঁ! জাযাকাল্লাহ খাইরান..'।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর উর্দূতে আমার অসাচ্ছন্দ্যতা টের পেয়ে উনি পরিষ্কার আরবীতে বলা শুরু করলেন।

শেখ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী পাকিস্তানের একজন শীর্ষস্থানীয় আহলেহাদীছ আলেম এবং দাঈ। বর্তমানে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ সিন্ধে'র আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশে আমাদের ইজতেমায় ৩/৪ বার অতিথি হয়ে যাওয়ার সুবাদে বাংলাদেশের আহলেহাদীছদের নিকটে তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ১৯৯৭ সালে সর্বশেষ যখন উনি বাংলাদেশে যান তখন বয়সে অনেক ছোট ছিলাম। ফলে উনার সাথে সৌজন্য সালাম-কালাম ছাড়া ব্যক্তিগত কোন স্মৃতি আমার নেই। তবে আমাদের বাসায় উনার খাওয়া-দাওয়া করা, আব্বার সাথে সুরসিক আলাপচারিতা, ইজতেমার মাঠে তার আগুনঝরা বক্তব্য রাখা–সে সব কথা স্পষ্টই মনে পড়ে। এসব কারণে পাকিস্তানে আসার পর যাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলাম, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি থাকেন করাচীতে। ইসলামাবাদ থেকে দূরত্ব দীর্ঘ প্রায় দেড় হাযার কি.মি.। ফলে পাকিস্তানে আমার আসা প্রায় ৭ মাস হয়ে গেলেও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ এমনকি কোন প্রকার যোগাযোগেরও সুযোগ পাইনি।

মাঝে গত মার্চে দেশে ফেরার পথে করাচীতে ট্রানজিট টাইমটা বাড়িয়ে নিয়েছিলাম উনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যই। কিন্তু এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েও উনার অসুস্থতার কারণে সাক্ষাৎ হল না। দুই সপ্তাহ বাদে দেশ থেকে আবার যখন পাকিস্তানে ফিরে আসি, তখনও একই কারণে করাচীতে দু'দিন থাকলাম। উনাকে হাদিয়া দেয়ার জন্য উনার অতি পসন্দের দই-মিষ্টিও নিয়ে এসেছিলাম দেশ থেকে। কিন্তু এবারও উনার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাৎ হল না। যদিও উনি এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন, একবার জামে'আ রহমানিয়াতে এসে নিজেই দেখা করতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন অজানা কারণে করলেন না, এমনকি ফোনেও কিছু জানালেন না। ফলে ভেতরে ভেতরে উনার প্রতি একটু অভিমান বোধহয় জমে উঠেছিল। আমীরুল ভাইয়ের কাছে ক্ষোভটা প্রকাশও করেছিলাম। পরে জানলাম আমীরুল ভাই সেটা উনাকে জানিয়েছেন এবং শায়খ নিজেও দুঃখও প্রকাশ করেছেন, আর বলেছেন পরবর্তীবার ইসলামাবাদ গেলে উনি অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।

তারপর আরো প্রায় দু'মাস গত হয়েছে। আজ তিনি হঠাৎ ফোন করলেন এবং জানালেন আগামী ৭ জুন বিকালে উনি আমার সাথে দেখা করবেন। সেই সাথে জানালেন উনি করাচীতে কেন আমার সাথে দেখা করেননি সেটাও সাক্ষাতে বলবেন। শায়খের কণ্ঠে অভিভাবকসূলভ উষ্ণতার ছোয়া সুস্পষ্ট, মনের অজান্তে যা একরাশ প্রশান্তি ও ভরসার স্পর্শ দিয়ে যায়। তাঁর ফোনটি পেয়ে পরদিনের পরীক্ষার চাপটাও যেন হালকা হয়ে এল।

৭ জুন বিকেলে সেমিস্টার ফাইনালের সর্বশেষ পরীক্ষাটা দিয়ে এসে উনাকে ফোন করলাম। উনি বললেন, আমি সারগোদায় এক প্রোগ্রামে আছি, আগামীকাল তোমার সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আমি ইসলামাবাদে উনার সাথে সাক্ষাতের স্থানটি জানতে চাইলাম। উনি বললেন, তার দরকার হবে না, আমি নিজেই আসব তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পরের দিন ৮ জুন সন্ধার পূর্বে উনি ফোন করে জানালেন উনি এখুনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন এবং সাক্ষাতের পর আমাকে সাথে নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে একটা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন। ফোন পেয়ে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিলাম। মাগরিবের পরপরই উনার গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আমার হোস্টেলের পার্কিং চত্বরে উপস্থিত হল। আমি আগেই এসে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রাইভেট কারটি থামতেই উনি দরজা খুলে বের হয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘদেহী মানুষটির স্নেহপূর্ণ আলিঙ্গনে বেশ কিছুক্ষণ আটকা পড়ে রইলাম। সেই মুখভরা দাড়ি, মায়াময় চেহারা এবং প্রশান্ত দিলখোলা ব্যবহার, ১৫/১৬ বছর দেখা মানুষটি সে রকমই রয়ে গেছেন, কেবল বয়সের ছাপটাই একটু চোখে পড়ছে।

গাড়িতে উঠার পর আমরা রওয়ানা হলাম রাওয়ালপিণ্ডির বেশু রোডস্থ আল-হামারাইন আহলেহাদীছ মাদরাসার উদ্দেশ্যে। সেখানে আজ 'খতমে বুখারী'র অনুষ্ঠানে শায়খ প্রধান অতিথি। পথিমধ্যে নানা বিষয়ে দীর্ঘদিনের জমানো কথাবার্তা হল। বাংলাদেশের খবরাখবর বিস্তারিত জানতে চাইলেন। আব্বার কারান্তরীণ হওয়া এবং মুক্তি পাবার খবর জানতেন আগে থেকেই। সেসব নিয়ে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। সেই সাথে স্মরণ করিয়ে দিলেন 'ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া' হিসাবে নবী-রাসূলের এই সুন্নাতের হিস্যা তো আমাদের কিছু নিতেই হবে। জানতে চাইলেন পরিচিতজনদের কথা একে একে নাম ধরে। ড. আব্দুল বারী, শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী, প্রফেসর শামসুল আলম, মাওলানা মুসলিম, মাহমুদ আলম আর কত নাম যে বললেন! নামগুলো এতদিনেও ভুলেননি। স্মরণ করলেন প্রথমবার বাংলাদেশে গিয়ে তাঁর সেই বিড়ম্বনায় পড়ার কাহিনী। যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় গিয়ে আব্বার নাম করতেই তাঁকে প্রায় বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল সেদিন। আফসোস করে বললেন আহলেহাদীছদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে যতটা আগানো দরকার আগাতে পারছি না আমরা। জানতে চাইলেন হোস্টেলে আমার থাকা-খাওয়ার কোন সমস্যা হচ্ছে কি-না, ভাত-মাছের মত বাঙালী খাবার ঠিকমত পাচ্ছি কি-না ইত্যাদি। মাছের প্রসঙ্গ উঠতে উনি তো হেসেই অস্থির। বাঙালী যে মাছের পাগল, কাঁটাসহ গোটা মাছ খেতে পারে, এমন সব কথা সারা পাকিস্তানেই মাশহূর। বেশ রসিয়ে সেকথা পুনরাবৃত্তি করে বললেন, আজ রাতে তোমাকে মাছ খাওয়াবো। মানুষটা ঠিক আগের মতই তীক্ষ্ণ রসবোধসম্পন্ন এখনো। তাঁর ড্রাইভার এবং খাদেম দু'জনই তাঁর সাথে এত সহজভাবে হাস্যরস করছিল, মনে হচ্ছিল তাঁরা পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছার পর মাদরাসার অফিসে বসে আব্বার সাথে ফোনে কথা বলিয়ে দিলাম। প্রায় ৫/৭ মিনিট কথা হল। তারপর উনি বক্তব্য দেয়ার জন্য মসজিদে ঢুকলেন। উনার পূর্বে বক্তব্য রাখছিলেন প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী যহীর। বক্তব্য শেষে বের হওয়ার সময় মসজিদের শেষ মাথায় দেখা হল শায়খের সাথে। বরাবরের মত স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে কুলাকুলি করতে করতে বললেন, 'বেটা বাইরে বেশী ঘোরাঘুরি করো না, সবসময় পড়াশোনার মধ্যে থাক'। এই মহান মানুষটা সেই প্রথমদিন থেকেই দেখা হলে নিয়মিত এই উপদেশটি দেন। জানিনা 'পথের প্রতি আমার গভীর টান'টা উনি কিভাবে ধরতে পেরেছেন, আর কিভাবেই বা প্রতিবার আমাকে দেখলে প্রথম পলকেই তার সেটা মনে পড়ে যায়। একেই বোধহয় বলে 'ফিরাসাত'।

শায়খ নাছের রহমানী প্রায় দেড় ঘণ্টা টানা বক্তব্য রাখলেন। প্রথমদিকে কণ্ঠের আওয়াজে বয়সের ছাপ অনুভূত হলেও ধিরে ধিরে সেই বজ্রকণ্ঠের উত্তাপ টের পেতে শুরু করলাম। মূলতঃ ব্রেলভীদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রসঙ্গেই কথা বললেন। বলছিলেন, অধিকাংশ মুসলমান এখন কালেমার প্রথম অংশটির কথা ভুলে গেছে, তারা কেবল ধরে আছে কালেমার ২য় অংশটি। অথচ একজন পূর্ণাঙ্গ তাওহীদবাদী হতে

গেলে 'লা ইলাহা' তথা মানহাজুন নাফী (গাইরুল্লাহকে অস্বীকৃতি) এবং 'ইল্লাল্লাহ' তথা মানহাজুল ইছবাত (আল্লাহকে স্বীকৃতি) উভয়টির উপরই সমানভাবে কায়েম থাকতে হবে, নতুবা সে তাওহীদের পূর্ণ হক্ব আদায় করতে পারবে না'। তিনি আরো বলেন, আক্বীদার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভারী আমল 'তাওহীদ' এবং আমলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভারী আমল 'সুন্দর আচরণ'। তিনি অসার যুক্তিবাদীদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন, আমরা সবচেয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ি কুরআন ও হাদীছের মাজাযী তা'ভীল তথা রূপক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। এই রূপক তা'ভীল করতে গিয়ে নিজের খুশী মত আল্লাহকে আমরা নিরাকার, সর্বত্র বিরাজমান বানিয়ে দিয়েছি, আর রাসূল (ছাঃ)-কে পরিণত করেছি নূরে মুজাস্সাম, মুশকিল কুশা কিংবা হায়াতুন্নবীতে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এইসব মাজায বা রূপক কাল্পনিক কথাবার্তা বা কাজকর্মের কোন স্থান ছিল না। 'মাজায' জিনিসটা আবিষ্কার হয়েছে ছাহাবায়ে কেরামের যুগের অনেক পরে মুশরিক ও বিদ'আতীদের হাতে। রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত দ্বীন ছিল অতি সুস্পষ্ট ও সহজ-সরল। মাজাযপন্থীরাই দ্বীনের ব্যাখ্যায় মস্তিষ্কপ্রসূত নানা যুক্তির সাহায্যে কাল্পনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে এবং দ্বীনকে বিকৃত করেছে'।

রাত ১২টার দিকে প্রোগ্রাম শেষ হল। পার্শ্ববর্তী এক বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি। উনি আমার হাত ধরে বললেন, বক্তৃতা পুরোটা বুঝতে পেরেছো? আমি বললাম, জি শায়খ! সারাংশটা বুঝেছি, তবে তার চেয়ে ভাল লাগছিল আপনার দরাজ কণ্ঠটা, আমি যেন সেই ১৫ বছর পূর্বে রাজশাহীর ইজতেমার ময়দানে ফিরে গিয়েছিলাম। উনি উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন।

খাওয়ার সময় উনার পাশেই বসালেন। মেজবানদের বললেন, আমার জন্য ভাত নিয়ে আসতে। তারপর নিজ হাতে মুরগী, দুম্বার গোশত আমার প্লেটে তুলে দিলেন। খাবার শেষ করে উঠার সময় আবার প্লেটে কয়েক পিস গোশত ঢেলে দিলেন। পেটে জায়গা একটুও নেই তা সত্ত্বেও বাধা দিলাম না। কারণ নিছক বৈঠকী ফর্মালিটি নয়, সত্যিকারের ভালবাসা আর প্রগাঢ় আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ তাতে অনুভব করলাম। সেটা আব্বার প্রতি এবং সেইসাথে বাঙালী আহলেহাদীছদের প্রতিও। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে সে ভালবাসার উত্তাপটুকু গ্রহণ করলাম।

তারপর ইসলামাবাদ ফেরার পথে উনি বললেন, 'তোমাকে আজ মাছ খাওয়ানোর কথা ছিল, কিন্তু খাওয়াতে পারলাম না, আমি আগে বুঝতে পারিনি এরা এখানে রাতের খাবারের আয়োজন করেছে'। তারপর আমার আপত্তি সত্ত্বেও বিভিন্ন সুস্বাদু ডেজার্টের জন্য বিখ্যাত 'তাহযীব'-এর একটি আউটলেটের সামনে গাড়ী দাঁড় করালেন এবং কুলফী আইসক্রিম ও ম্যাংগো শেক খাওয়ালেন। রাত তখন প্রায় দেড়টা বাজে।

সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসতে আসতে রাত প্রায় দু'টো। মেইন গেটে নামিয়ে দিয়ে উনারা চলে গেলেন। গাড়িতেই উনাকে অনুরোধ করলাম যে, মাসিক আত-তাহরীকের জন্য একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই। উনি আন্তরিকভাবেই সাড়া দিলেন এবং পরের দিন দুপুরে উনার হোটেল রুমে বসতে চাইলেন।

পরদিন ৯ জুন দুপুর গড়িয়ে গেল। কিন্তু কথামত উনি কলও করলেন না, গাড়িও পাঠালেন না। ভাবলাম উনি বোধহয় ব্যস্ত কিংবা বিশ্রামে আছেন। তাই আমিও আর কল করলাম না। শেষতক আছরের ছালাতের পর উনাকে রিং করব ভাবছিলাম। কিন্তু সে পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হল না, ছালাত শেষ হতে না হতেই উনি রিং করে জানালেন উনি আসছেন, আমাকে বললেন তৈরী থাকতে।

দ্রুত রেডি হয়ে হোস্টেল পার্কিং-এ দাঁড়ালাম। মিনিট দশেকের মধ্যে উনি আসলেন। গাড়িতে উঠার পর বললেন, কাল রাতে আমি একটুও ঘুমাতে পারিনি। করাচী বিমানবন্দরে যে বোমা হামলা হয়েছে তাতে আমার এক প্রতিবেশী নিহত হয়েছেন, তার খবরাখবর নিয়ে টেনশনে ছিলাম। ফলে আজ সকালটা ঘুমে কেটে গেছে। আজকের প্রোগ্রাম শেষে সাক্ষাৎকারের জন্য তোমার সাথে বসব ইনশাআল্লাহ।

ইসলামাবাদ থেকে আবার রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হলাম আমরা। মাগরিবের পূর্বে রাওয়ালপিণ্ডি বিমানবন্দরের পার্শ্বে মুসলিম টাউনের তৃতল আহলেহাদীছ মসজিদ 'জামে মসজিদ মারওয়া'তে উপস্থিত হলাম। মাগরিব পর প্রোগ্রাম শুরু হল। যথারীতি শায়খ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখলেন আক্বীদা বিষয়ে।

এশার ছালাত আদায় করে আমরা বের হলাম। রাত তখন ৯টা কি সাড়ে ৯টা বাজে। ভাবলাম ১০টার মধ্যে যদি ইসলামাবাদ পৌঁছতে পারি তাহলে নিতে পারব সাক্ষাৎকারটা। কিন্তু মেইন রোডে উঠার পর শায়খ ড্রাইভারকে কি যেন বলে দিলেন। ড্রাইভার সোজা রাওয়ালপিণ্ডি স্টেডিয়ামের নীচে অবস্থিত বিশাল রেস্টুরেন্টপাড়ায় নিয়ে হাজির হল। এই এলাকায় কেবলই রেস্টুরেন্ট, অন্য কিছু নেই। সংখ্যায় কম করে হলেও ২০/৩০টা হবে। আমরা পাকিস্তানী 'বায়তুল মুকাররাম' মসজিদের পার্শ্বে শাহিনশাহ নামক এক রেস্টুরেন্টে বসলাম। ঐতিহ্যবাহী আফগানী কায়দায় বসার বিলাসী সিস্টেম আর খানা-দানাও সব আফগানী এবং কাশ্মীরী পদের। শায়খ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একটি দুম্বা থেকে ৪ কেজি গোশত কাটালেন এবং একটা বড় মাছের অর্ডার দিলেন। পুরা ঘণ্টাখানেক সময় লাগল দুই প্রকার গোশত ও মাছের ফ্রাই হতে। এত সময় লাগবে বুঝতে পারিনি। দীর্ঘ সময় বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে পড়লাম। সেই সাথে একটু অস্থিরও লাগছিল সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় চলে যাচ্ছে দেখে। অবশেষে শায়খকে বললাম, রাত তো বেশ হয়ে গেল, মনে হচ্ছে আজ নতুন করে বসার আর সময় হবে না, আমরা কি এখানেই সাক্ষাৎকারের কাজটি শুরু করতে পারি? উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'এক কাজের মধ্যে আরেক কাজ ভালভাবে হবে না, খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়া যাক আগে'। ওয়েটার প্রথমে বিভিন্ন ফল ও আর দইয়ের শেক দিয়ে তৈরী সুস্বাদু একপ্রকার সালাদ দিয়ে গিয়েছিল। এবার ফয়েল পেপারে মুড়িয়ে আনল সরাসরি আগুনে পুড়িয়ে বারবিকিউ করা গোশত, তারপর হালকা মসলায় রান্না করা রোস্ট। একটু পরে মাছের আস্ত ফ্রাই। আফগানী রুটি দিয়ে গোশত ভাজা এবং রোস্ট দুটোরই অসাধারণ স্বাদ লাগল। দুম্বার বাজে গন্ধটাও আজ আর নাকে জ্বালা ধরাচ্ছিল না, রান্নার বিশেষ পদ্ধতির কারণে। আমার জন্য ভাতেরও অর্ডার দিয়েছিলেন শায়খ, তবে সেটা খেতে পারিনি। কিন্তু কেজিখানেক ওজনের মাছটা প্রায় পুরোটাই খেতে হল। উনারা কেউ হাতই লাগালেন না। যেন নষ্ট না হয় এজন্য রুটি বাদ দিয়ে শুধু মাছ খেতে লাগলাম। তবুও শেষ করতে পারলাম না। খাবার শেষে দেখলাম ৪ কেজি গোশত আমরা পাঁচজনেই খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছি। আর আমার পেটে মাছটাতো এক্সট্রা গেছেই। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে গলা থেকে যখন এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত নামছে না। পরবর্তী পরিণতি নিয়ে যখন শংকিত, সেই মুহূর্তে শায়খের রাগত অনুযোগ, 'তুমি তো তেমন কিছুই খেলে না, মাছটাও শেষ করতে পারলে না'!! 'ছেড়ে দে মা কেন্দে বাঁচি'–এই যখন অবস্থা, তখন এমন কথা শুনে প্রত্যুত্তর দেয়ার কিছু খুঁজে পেলাম না, আর খুঁজে পেলেও এই ভরপেটে সে কথা বহির্গত হবার সম্ভবনা ছিল না। কেবল অসহায়দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে মনে স্বগতোক্তি করলাম, এমন পরিহাসটা মনে হয় না করলেও পারতেন।

খাওয়ার পর গাড়ি যখন ইসলামাবাদে এসে আমার ইউনিভার্সিটির দিকে টার্ন নিল, তখন বুঝলাম এ দফায় আমার এ্যাসাইনমেন্টটা আর সফল হচ্ছে না। শায়খকে জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন, রাত তো অনেকটা হয়ে গেল, কি করা যায়! একটু ভেবে বললেন, আমি রামাযানে আসছি, এ সময় ইনশাআল্লাহ তোমার সাথে বসব। আই-১০ সেক্টরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পিছনের গেটে উনারা আমাকে নামিয়ে দিলেন। বার বার আপত্তি করা সত্ত্বেও খাদেম আব্দুল আযীয ভাই শায়খের নির্দেশে আমার পিছু পিছু এসে একেবারে গেটে ঢুকিয়ে গেলেন। এভাবেই শায়খের সাথে চমৎকার দুটো স্মরণীয় দিন কাটল। মনের মধ্যে একটু খুতখুতি অবশ্য রয়ে গেল সাক্ষাৎকারটা না নিতে পারায়। পরবর্তীতে রামাযানে এসেছিলেন ইসলামাবাদে অল্প কিছুক্ষণের জন্য। ফলে দেখা করার সুযোগ হয়নি। সামনে কোনদিন সে সুযোগটা হয়ত মিলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

[লেখক : ছাত্র, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

আলোকপাত

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

প্রশ্ন (০১) : জাতীয়তাবাদ কী? ইসলামের সাথে জাতীয়তাবাদের সাংঘর্ষিক দিকগুলো কী কী?

-বখতিয়ার ফরীদ
মডার্ণ, রংপুর।

উত্তর : ফরাসী বিপ্লবের কিছু পূর্বে তথা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 'জাতীয়তাবাদ' (Nationalism)-এর আবির্ভাব ঘটে। এই মানবতা বিধ্বংসী অভিশপ্ত মতবাদের হোতা ছিলেন ইটালির মুসোলীনি ও জার্মানের ফ্যাসিবাদের অন্যতম প্রবক্তা হিটলার। এর মৌলিক উপাদান ৬টি। (১) বংশ (২) অঞ্চল (৩) ভাষা (৪) বর্ণ (৫) অর্থনৈতিক ঐক্য এবং (৬) শাসনতান্ত্রিক ঐক্য। উক্ত ছয়টি উপাদানের মধ্যে ধর্মকে স্থান দেওয়া হয়নি। কেননা জাতীয়তাবাদ ধর্মকে নস্যাৎ করার প্রথম কোন মতবাদ। একই স্বার্থ ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে একটি জাতি বলে। আর 'জাতি' ভিত্তিক মতবাদকে 'জাতীয়তাবাদ' বলে। যা নির্দিষ্ট একটি জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তৈরী হয়। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, Nationalism is the desire by a group of people who share the same race, culture, language etc. to form an independent country. 'জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একই ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি, গোষ্ঠী ইত্যাদির অংশীদার একদল মানুষের একটি স্বাধীন দেশ গঠনের আকাংখা'।

জাতীয়তাবাদ ইসলাম বিরোধী একটি জাহেলী মতবাদ। এটি আল্লাহ্র বান্দাকে দ্বীনহীন করে দেয়। বংশ, অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের শ্লোগানে অভিন্ন মুসলিম মিল্লাতকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। মূলতঃ এটি বস্তুবাদী ও ধর্মহীন সেক্যুলার মতবাদের একটি শাখা মাত্র।

ইসলাম বনাম জাতীয়তাবাদ :

(১) পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ধর্মহীন সেক্যুলার বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র অহীর উপর প্রতিষ্ঠিত। (২) জাতীয়তাবাদ দুনিয়াবী স্বার্থের নিরিখে তৈরী হওয়া একটি মানব রচিত মতবাদ। আর ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন। (৩) এটি সারা বিশ্বকে টুকরা টুকরা করার সংকীর্ণ মানসিকতায় বিশ্বাসী। অথচ ইসলামে এর কোন স্থান নেই। (৪) এটা মূলতঃ জাহেলী যুগে প্রচলিত গোষ্ঠী ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার নাম। অথচ আল্লাহ জাহেলী সভ্যতার দিকে ফিরে যেতে নিষেধ করেছেন। (৬) এটি মূলতঃ মানুষে মানুষে ও গোত্রে-গোত্রে বিভক্ত ও ভেদাভেদ করে। অথচ ইসলাম সারা বিশ্ববাসীকে একই আদর্শের অনুসারীতে বিশ্বাসী।

প্রশ্ন (০২) : সা'দ (রাঃ)-এর ব্যাপারে কয়টি বিধান জারী হয়েছে এবং তা কী কী?

-আব্দুল্লাহ আল-মুজাহিদ
বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতের মোট চারটি বিধান নাযিল হয়েছে। যেমন- (ক) পিতা-মাতা সম্পর্কে *(সূরা লোকমান ৩১/১৫; ছহীহ মুসলিম হা/৬৩৯১)*। (খ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে *(সূরা আনফাল ৮/১; ছহীহ মুসলিম হা/৬৩৯১, 'ছাহাবীগণের ফযীলত' অধ্যায়-৪৫)*। (গ) সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে *(ছহীহ বুখারী হা/৬৭৩৩, 'কন্যাদের মীরাস' অনুচ্ছেদ-৬, 'ফারায়েয' অধ্যায়-৮৬)*। (ঘ) মদ হারাম হওয়া প্রসঙ্গে *(মায়েদা ৫/৯০; ছহীহ মুসলিম হা/৬৩৯১)*।

প্রশ্ন (০৩) : 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' সংগঠনের ইতিহাস ও আক্বীদা সম্পর্ক জানতে চাই?

-আব্দুল্লাহ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব হাসান আল বান্না ১৯২৯ সালে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন সংগঠন চালু করেন। অল্প সময়ে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০ লাখে উন্নীত হয় এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্রেও প্রভাব বিস্তার করে। এই সংগঠনের উপর প্রচণ্ড সরকারী নির্যাতন চালান হয়। এতে ১৯৪৯ সালে হাসান আল বান্না মারা যান।

১৯৫২ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে জেনারেল নাজীব ক্ষমতায় এলে ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রথম দিকে নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন দেয়। কিন্তু সরকার যখন পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় তখন সরকারের বিরোধিতা শুরু করে। এতে নাছের ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সদস্যদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। কিছুদিন পর পুনরায় তারা কার্যক্রম শুরু করেন এবং এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন প্রখ্যাত গবেষক সাইয়িদ কুতুব। নাছের ১৯৬৬ সালে সাইয়েদ কুতুবসহ কয়েকজন ইখওয়ান নেতার ফাঁসি দেন এবং ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বর্তমানেও ইখওয়ানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তবে আক্বীদাগত ত্রুটি থাকার কারণে সালাফী বিদ্বানগণ এই সংগঠনকে পসন্দ করেন না। তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও চরমপন্থার সংমিশ্রণ রয়েছে *(রাজনীতিকোষ, পৃঃ ৮০)*।

প্রশ্ন (০৪) : শী'আ সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে চাই?

-আহমাদুল্লাহ
কুমিল্লা।

উত্তর : 'শী'আ' অর্থ অনুসারী, গোষ্ঠী, সাহায্যকারী ইত্যাদি। ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফসল হিসাবে আলী (রাঃ) এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে শী'আ সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। মূলতঃ মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রশ্নে শী'আদের উৎপত্তি।

শী'আরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতা বা ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় আপোষ করার শর্তে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়। তখন মীমাংসার জন্য আলী (রাঃ)-এর পক্ষে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) আর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে আমর ইবনু আছ (রাঃ)-কে শালিস নিযুক্ত করা হয়। এতে একশ্রেণীর লোক আলী (রাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করে। তারা ইতিহাসে 'খারেজী' বলে পরিচিত। আরেক শ্রেণী এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। তাদেরকেই মূলতঃ 'শী'আ' বলা হয় *(আত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ২৭৪-২৭৭)*।

ইরাকের কূফা থেকেই শী'আদের ফেৎনা প্রকাশিত হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার নিয়েও তারা কুটূক্তি করে তাঁদেরকে অপমান করেছে। হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা করে আয়েশা (রাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাধ আরোপ করেছে। ইমামত ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের মৌলিক দাবীর প্রেক্ষিতে তারা নেতৃত্বকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার সাথে সংযুক্ত করেছে। যেমন- اَلْإِيْمَانُ بِالْإِمَامِ جُزْءٌ مِنَ الْإِيْمَانِ بِاللهِ 'নেতৃত্বের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার অংশ' (নাঊযুবিল্লাহ)। এছাড়া তারা নেতৃত্বকে দ্বীনের রুকন সমূহের মধ্যে একটি রুকন বলে বিশ্বাস পোষণ করে। যেমন- وَيَعْتَبِرُ الشِّيْعَةُ الْإِمَامَةَ.. رُكْنًا مِّنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ 'শী'আরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে ইসলামের রুকন সমূহের একটি রুকন গণ্য করে থাকে'।

তাই শী'আদের সাথে ইসলাম ও ইসলামী আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই। আজও শী'আরাই মুসলিম উম্মাহ্র সবচেয়ে বড় শত্রু। সঊদী আরব, কুয়েত, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে যারা সালাফী তথা আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী তাদেরকে উৎখাত করাই তাদের মূল কর্মসূচী।

প্রশ্ন (০৫) : থ্রি-জি (৩-এ) কী? এর উৎপত্তি ও ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাই?

-সাখাওয়াত

চককাযিযিয়া, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : থ্রি-জি (৩-এ) ইন্টারনেট বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কার। তারবিহীন মোবাইল নেটওয়ার্কের থার্ড জেনারেশন বা তৃতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তিকে সংক্ষেপে 'থ্রি-জি' বলে। আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনেকেশন সংস্থার (আইটিইউ) মতে, থ্রি-জি প্রযুক্তি হচ্ছে এমন এক মোবাইল প্রযুক্তি যাতে জিএসএম, ইউডিজিই, ইউএমটিএস এবং সিডিএমএ-২০০০ প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত। টুজির চেয়ে থ্রি-জিতে উচ্চগতির উন্নত মোবাইল সেবা পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে থ্রি-জির জন্য নির্ধারিত তরঙ্গ ২ হাযার মেগাহার্জ হলেও টুজির জন্য নির্ধারিত তরঙ্গ ৯০০ এবং ১ হাযার ৮০০ মেগাহার্জ এতে কাজ করবে।

এটি প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয় জাপান। ১৯৯১ সালে ফিনল্যাণ্ডে টুজি প্রযুক্তির শুরু হয়। অতঃপর ১০ বছর পর ২০০১ সালে জাপানে বাণিজ্যিকভাবে থ্রি-জি সেবা চালু হয়। এটি ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম বাজারে নিয়ে আসে 'এনটিটি ডোকোমা' নামক মোবাইল অপারেটর কোম্পানি। ২০০৩ সালে জাপানি ভেরিজা ওয়্যারলেস অপারেটর থ্রি-জি প্রযুক্তি বাজারে নিয়ে আসে।

থ্রি-জির রয়েছে অনেক সুবিধা। যেমন- উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার, ভিডিও কনফারেন্স ও ভিডিও কলিং, টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান, বাণিজ্যিক কার্য সম্পাদন, কম খরচে বেশি সুবিধা, মোবাইল টিভি, একই সঙ্গে অনেক কাজ সহ তথ্যের নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি। থ্রি-জির অনেক খারাপ দিকও রয়েছে। যেমন- নৈতিকতা হরণ, সন্ত্রাস কার্যক্রম বৃদ্ধি, অর্থের অপচয় এবং সময়ের অপচয়।

প্রশ্ন (০৬) : আরব দেশে কে মূর্তি পূজা শুরু কে?

-তানভীর

মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : আবু খুযা'আহ আমর ইবনে আমের আল-লুহাই' সর্বপ্রথম আবর দেশে মূর্তি পূজা চালু করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমর ইবনু আমের সর্বপ্রথম মূর্তির নামে উটনি মুক্ত হস্তে ছেড়ে দেয় এবং মূর্তি পূজা শুরু করে। আমি তাকে দেখছি সে তার নাড়ীভুড়ি জাহান্নামের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে *(বুখারী হা/৩৫২১; সিলসিলা ছাহীহহা হা/১৬৭৭)*।

প্রশ্ন (০৭) : ইবরাহীম (আঃ) তিন দিন তিনশ' উট কুরবানী করেছিলেন। উক্ত কথা কি সত্য?

-আহমাদুল্লাহ

বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য বানোয়াট। তিনি স্বপ্ন দেখার পর স্পষ্ট হয়ে ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করতে গিয়েছিলেন *(ছফফাত ১০২-১০৭)*। তাছাড়া ইবরাহীম (আঃ) এত উট কোথায় পেলেন? বরং যবহে করার প্রস্তুতির সময় ইসমাঈল (আঃ) বলেছিলেন, আব্বা! এই জামাটি ছাড়া আমার তো আর কোন জামা নেই। এটা খুলে নিন যাতে আপনি যবহের পর এর দ্বারা কাফন পরাতে পারেন *(আহমাদ হা/২৭০৭, সনদ ছহীহ)*। অতএব নবী-রাসূলগণের নামে ভিত্তিহীন কথা বলা মহা অন্যায়।

প্রশ্ন (০৮) : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন আদম (আঃ) অপরাধ করে ফেললেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসীলায় ক্ষমা চাচ্ছি, যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পারলে, অথচ আমি তাকে এখনো সৃষ্টি করিনি? আদম (আঃ) তখন বললেন, হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাকে আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং আমার মাঝে আপনার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেন তখন আমি মাথা তুলে দেখি যে, আরশের পায়ের সাথে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা আছে। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তির নামই আপনার নামের সাথে যুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ হে আদম! নিশ্চয় মুহাম্মাদই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। তুমি তার অসীলায় আমার কাছে দু'আ কর আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না** *(মুস্তাদরাক হাকেম হা/৪২২৮)*। ***বর্ণনাটি কি ছহীহ?

-আব্দুল আউয়াল, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এটি একটি প্রসিদ্ধ জাল বর্ণনা। এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম নামে দুইজন মিথ্যুক রাবী আছে *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫)*। তাই উক্ত বর্ণনা প্রচার করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (০৯) : যিলহজ্জ মাসের প্রথম ৯টি ছিয়াম পালনের পক্ষে কোন দলীল আছে কি?

-আব্দুল খালেক

দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ৯টি ছিয়াম পালন করতেন *(নাসাঈ হা/২৩৭২, 'ছিয়াম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১০) : ইসমাঈল (আঃ)-এর পায়ের আঘাতে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং জিবরীল (আঃ)-এর পায়ের গোড়ালী কিংবা পাখার আঘাতে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়েছে *(বুখারী হা/৩৩৬৪-৩৩৬৫, 'নবীদের ঘটনাবলী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯)*।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্র সংবাদ

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা ২০১৪

যশোর ২০ আগষ্ট, বুধবার : অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকায় যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এস.এস.সি./সমমান ও এইচ.এস.সি/ সমমান পরীক্ষা ২০১৪ এর **'কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা ২০১৪'** অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি 'যুবসংঘ'-এর যশোর যেলার সভাপতি মোঃ আশরাফুল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন' অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল আযীয, যশোর সদর উপযেলার সভাপতি জিল্লুর রহমান, 'যুবংসঘ'-এর সাবেক যশোর যেলার সভাপতি জনাব আব্দুস সালাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক তরীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ, মুযাফফর বিন মুহসিন লিখিত ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন ও তাওহীদের ডাক বইয়ের প্যাকেট উপহার দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্র/ছাত্রীসহ অভিভাবক ও সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়হ, বাঁকাল সাতক্ষীরা ২১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারের হল রুমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এস.এস.সি./সমমান ও এইচ.এস.সি/ সমমান পরীক্ষা ২০১৪ এর **'কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা ২০১৪'** অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', সোনামণি'-এর যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, কর্মী, সুধীমণ্ডলী।

টিটু মিলনায়তন, বগুড়া, ২৪ আগস্ট, রবিবার : অদ্য বাদ যোহর বগুড়ার তিতু মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক **'কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা ২০১৪'** অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও পীস টিভি বাংলার আলোচক আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। তিনি তার ভাষণে বলেন, যুগে যুগে মহান আল্লাহ যত নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাদের সকলের মূল দায়িত্ব ছিল আল্লাহ্র যমীনে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। সকল নবী ও রাসূল আল্লাহ প্রদত্ত সে দায়িত্ব পালন করে অন্ধকার এ পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। বর্তমানে বিশ্বকে পুনরায় জাহেলিয়াতের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই সর্বত্র জ্বলছে অশান্তির দাবানল। পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে প্রথমে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসতে হবে ছাত্র ও যুবসমাজকে। কারণ ছাত্র সমাজ ছাড়া কোন আদর্শই প্রতিষ্ঠা হয়নি। পরিশেষে তিনি তরুণ ছাত্র সমাজকে নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি ও পীস টিভি বাংলার আলোচক আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালম, গাইবান্ধা (পূর্ব)-এর সভাপতি মশিউর রহমান, গাইবান্ধা (পশ্চিম)-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি শরীফুল ইসলাম সহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও সুধীমণ্ডলী।

নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা ২২ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪ ঘটিকায় 'তাওহীদ রিসার্চ সেন্টার ও পাঠাগার' প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও সঊদী প্রবাসী মুহাম্মাদ তোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছলেহ উদ্দীন, জয়পুর ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল কাযী আলমগীর হোসেন, বাখর নগর আলিম মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা আমীর হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হান্নান।

মধ্য বাউসিয়া, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ ১৫ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব মধ্য বাউসিয়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কানাডা প্রবাসী রুহুল আমীন উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পীস টিভি বাংলার আলোচক মুযাফফর বিন মুহসিন। তিনি 'হক্ব মানতে বাধা কোথায়' বিষয়ের উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও কর্মী ওয়ালিউল্লাহ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন নূরে আলম।

যেলা সংবাদ

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা (পূর্ব) ৪ জুলাই ৫ রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ সুন্দরগঞ্জ উপযেলা জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আগলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুরুব্বী মুহাম্মাদ শাহাদৎ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামূন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর

সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মশিউর রহমান, ইসলামী ব্যাংক গাইবান্ধা শাখার সহকারী কর্মমর্তা মুহাম্মাদ মুস্তাফিযুর রহমান। উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ এলাকাটি মাযহাবপন্থী। সেখানে এই প্রথম 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হামদ।

মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসা, গাইবান্ধা পশ্চিম ৫ জুলাই ৬ রামাযান : অদ্য বেলা সাড়ে ৩-টায় মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা শাখার উদ্যোগে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আহমাদ আলী দেওয়ান, গাইবান্ধা (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা মশিউর রহমান, গাইবান্ধা টি.এণ্ড.টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ঈমাম ও গোবিন্দগঞ্জ উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান, 'সোনামণি' যেলা পরিচালক হাফেয ওবাইদুল্লাহ সহ উক্ত মাদরাসার 'যুবসংঘ'-এর কর্মীবৃন্দ এবং এলাকার সুধী মণ্ডলী প্রমুখ।

পাঁচবিবি, জয়পুরহাট ৪ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাঁচবিবি উপযেলা শাখার উদ্যোগে হিলি বাজার সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা শাখা সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি যয়নুল আবেদীন, সাধারণ সম্পাদক রায়হানুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলার সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক, অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসাইন, পাঁচবিবি উপযেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুন নূর প্রমুখ।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট, ১১ জুলাই, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কমরগ্রাম আহলেহাদীছ বড় জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর যৌথ উদ্যোগে এক 'আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ডঃ মুহাম্মাদ আলী, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মেছবাহুল ইসলাম, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালিম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালামসহ যেলার দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ মোনায়েম হোসেনকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট জয়পুরহাট যেলার 'সোনামণি পরিচালনা পরিষদ' পূণর্গঠন করা হয়।

ঘোনাপাড়া, জয়পুরহাট, ২৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সদর থানাধীন ঘোনাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঘোনাপাড়া 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' শাখার উদ্যোগে এক 'আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়। শাখা উপদেষ্টা আলহাজ্জ আশরাফ হোসেন মাস্টারের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, প্রচার সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আল-আমীন প্রমুখ।

চকশ্যামলীয়, রতনপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, ২৭ জুলাই, রবিবার : অদ্য বাদ আছর পাঁচবিবি থানাধীন রতনপুরের চকশ্যামলীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চকশ্যামলীয় 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' শাখার উদ্যোগে এক 'আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচবিবি উপযেলা শাখার প্রচার সম্পাদক সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক, পাঁচবিবি উপযেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুন নূর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক তারীকুল ইসলাম, হিলি হাকিমপুর ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

কালাই, জয়পুরহাট, ২৮ জুলাই, সোমবার : অদ্য বাদ আছর কালাই থানাধীন জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম্মাপাড়া 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' শাখার উদ্যোগে এক 'আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়। কালাই উপযেলা শাখা সভাপতি মুস্তাক আহমাদ সারোয়ারের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাহফূযুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম, অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, উপযেলা অর্থ সম্পাদক সুজাউল ইসলাম, জুম্মাপাড়া শাখা সভাপতি আব্দুল হামীদ, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মোনায়েম হোসেন, জুম্মাপাড়া মসজিদের পেশ ইমাম মুযাম্মেল হক প্রমুখ।

ঘোনাপাড়া, জয়পুরহাট ১৫ আগস্ট আশুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ঘোনাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত এক উপযেলা কমিটি গঠনের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আল-আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব, অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মোনায়েম হোসেন। পরিশেষে আল-আমিনকে সভাপতি এবং আসাদুযযামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ঘোনাপাড়া উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

গভরপুর, জামালগঞ্জ, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট ২২ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ গভরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত উপযেলা গঠন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব, আব্দুর রহীম মাস্টার। পরিশেষে আব্দুর নূরকে সভাপতি এবং মাহমূদুল হাসানকে সাধাারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট্য আক্কেলপুর উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

সোনামণি সংবাদ

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২ জুলাই ৩ রামাযান বুধবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১০-টায় ' সোনামণি' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মকতবে এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

পরিচালক আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। তিনি সোনামণিদের জন্য 'রামাযান মাসে করণীয় ও বর্জণীয়' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করেন 'সোনামণি'-এর যেলা সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন।

সুতাকল, সিরাজগঞ্জ ২ জুলাই ৩ রামাযান বুধবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় সোনামণি' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার যেলা কার্যালয়ে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামনি'-এর যেলা পরিচালক আব্দুল মুমিন।

চড়কুড়া, কামারখন্দ, ৩ জুলাই ৪ রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় চড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। তিনি 'সোনামণি সংগঠনের মযবূতির উপায়' সম্পর্কে দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর ঢাকা যেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক নাছরুল্লাহ, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আব্দুল মুমিন, সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন ।

চড়কুড়া, কামারখন্দ, ৩ জুলাই ৪ রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আব্দুল মুমিনের বাড়িতে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামনি'-এর যেলা পরিচালক আব্দুল মুমিন, সহ-পরিচালক আনোয়ার হোসাইন।

গারুদহ, সিরাজগঞ্জ ৪ জুলাই ৫ রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ গারুদহ শিশুসদন উচ্চ বিদ্যালয়ে সোনামণি সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষিণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র এলাকার মাতব্বর ও রাজিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাষ্টার আব্দুল্লাহ আল-হারুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। তিনি বিশুদ্ধ আক্বীদা, রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল এবং ইসলামী জ্ঞান বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামনি'-এর যেলা পরিচালক আব্দুল মুমিন, সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন, চড়কুড়া শাখা পরিচালক রুহুল আমীন, গারুদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আব্দুল লতীফ। প্রশিক্ষণের শেষে উপস্থিত সোনামণিদের একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। বলা বাহুল্য যে, জমঈয়তে আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া উক্ত সোনামণি বৈঠকটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে। এলাকার অনেক মুরুব্বীদের মন্তব্য হল যে, আমরা আপনাদের আলোচনা শুনে খুব খুশি এবং আনন্দিত হয়েছি। এভাবে যদি আপনারা সোনামণিদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে সমাজে আর অশান্তি থাকবে না। পরিশেষে তারা সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গারুদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'ইসলামী পরিবার গঠন ও সন্তান প্রতিপালন' বিষয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র শাখার দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ শাহিন।

গারুদহ, সিরাজগঞ্জ ৪ জুলাই ৫ রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'সোনামণি' বড়কুড়া শাখার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ রেযাউল করীমের দাওয়াতে তার বাড়ীতে এক 'ইফতার মাহফিল ও দায়িত্বশীদ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর যেলা পরিচালক আব্দুল মুমিন, সহ-পরিচালক আব্দুল মুমিন, চড়কুড়া শাখার পরিচালক রুহুল আমীন, শাখা প্রধান উপদেষ্টা রেযাউল করীম। ইফতার শেষে তারা সেখানে রাতের আহার গ্রহণ করেন।

মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা পশ্চিম ৫ জুলাই ৬ রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া ফসিরুদ্দীন হাফিযিয়া মাদরাসায় 'সোনামণি' গাইবান্ধা (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত যেলা পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও 'সোনামণি'-এর উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত 'সোনামণি' যেলা পরিচালক ও অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হাফেয ওবাইদুল্লাহ সহ বিভিন্ন শাখা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দ প্রমুখ। পরিশেষে হাফেয ওবাইদুল্লাহকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা ২০১৩-২০১৫ সেশনের জন্য পুনর্গঠন করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

জয়পুরহাট যেলার কালাই থানাধীন কাথাইল গ্রামের বাসিন্দা ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক দপ্তর সম্পাদক ও বর্তমান কালাই এলাকা শাখার সভাপতি শাহজাহান আলী মোল্লা (৬২) গত ২৯ জুন ২০১৪ ইং তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকার জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন*।

ঘটনাসূত্রে জানা যায়, মারা যাওয়ার পূর্বের দিন বাড়ীর পার্শ্বে জমিতে কাজ করার সময় বিষাক্ত পোকার দংশনে পা ফুলে ওঠে, এছাড়াও তিনি পূর্বে থেকেই রক্তশূন্যতা রোগে ভুগছিলেন। তাকে চিকিৎসার জন্যে জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই মেয়েসহ নাতি-নাতনীদের রেখে যান। তিনি পেশায় কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

একই দিনে রাত ৮.০০ টার সময় তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স মসজিদের ইমাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা সেলিমুল্লাহ বিন তাইমুর। জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন কালাই পৌরসভার মেয়র তৌফিকুল ইসলাম বেলাল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাহফূযুর রহমান, অর্থ সম্পাদক ও আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, সাবেক সহ-সভাপতি আনিছুর রহমান তালুকদার, সেক্রেটারী মাওলানা খলীলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ মুছত্বফা আলী, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখসহ বিপুল সংখ্যক এলাকাবাসী।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সহকারী সম্পাদক]]

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

ফিলিস্তীনে ঐক্যমত্যের সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত

শান্তি চুক্তিতে সই করেছে হামাস ও ফাতাহ আন্দোলন

শান্তি চুক্তিতে সই করে ফিলিস্তীনে ঐক্যমত্যের সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে গাযা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তীনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ও পশ্চিম তীরে সরকার পরিচালনাকারী ফাতাহ আন্দোলন। গাযা উপত্যকায় দু'পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, হামাস ও ফাতাহ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি ঐক্যমত্যের সরকার গঠন করবে। ইহুদীবাদী ইসরাইলের সঙ্গে ফাতাহ্র প্রধান ও স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের কথিত শান্তি আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর ফিলিস্তীনী দুই গ্রুপের মধ্যে এ ঐক্যমত্য অর্জিত হল। সমঝোতার খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাযা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরে হাযার হাযার মানুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ মিছিল করেছে।

হামাস ও ফাতাহ কর্মকর্তারা গাযায় এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তারা একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবেন এবং ছয়মাসের মধ্যে ফিলিস্তীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই ফিলিস্তীনী প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর মধ্যকার এ সমঝোতা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি তেলআবিব। এ কারণে এ সমঝোতার কথা ঘোষিত হওয়ার এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে গাযায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইহুদীবাদী ইসরাঈল।

এছাড়া দুই বৈরী সংগঠন হামাস ও ফাতাহর মধ্যে চুক্তির ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলেছে, এতে মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়া জটিল হয়ে পড়বে। মার্কিন সরকার ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষকে দেওয়া সহায়তা পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে বলেও ঘোষণা দিয়েছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইসরাঈল ফিলিস্তীনের হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে এবং সেখানে অবস্থিত গ্রুপগুলো সর্বদা পরস্পরবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকুক এমনটিই কামনা করে।

ইসরাঈল কর্তৃক গাযায় মর্মান্তিক হামলা

ঘটনার প্রেক্ষাপট : ২০ এপ্রিল ২০১৪ ফিলিস্তীনে ঐক্যমতের সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং রামি হামদাল্লাহকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী করে ২ জুন ২০১৪ গঠিত হয় ঐক্যমত্যের সরকার, যা ইসরাঈল মোটেও ভালভাবে নেয়নি। এমনকি ঐক্যমত্যের সরকারের সাথে কাজ করার ঘোষণা দেয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করে ইসরাঈল।

বিপদের সূত্রপাত : ১২ জুন ২০১৪ পশ্চিম তীরে তিন ইসরাঈল ইহুদী কিশোর অপহৃত হয় এবং ৩০ জুন ২০১৪ তাদের লাশ পাওয়া যায় হেবরন শহরের উত্তর-পশ্চিমে। ইসরাঈল পুরা ঘটনার জন্য ফিলিস্তীনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে দায়ী করে এবং ২ জুলাই ২০১৪ পূর্ব জেরুজালেমে চরমপন্থী ইহুদীরা ১৬ বছর বয়সী এক ফিলিস্তীনী কিশোরকে পুড়িয়ে হত্যা করে। যদিও ইসরাঈল প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই ঘটনার জন্য নিহত কিশোর মুহাম্মাদ আবু খুদাইর এর বাবার কাছে ফোন করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক ইসরাঈল-ফিলিস্তীন বিবাদের সূত্রপাত।

ঘটনার বাস্তবায়ন : উক্ত ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে হামাস সহ অবরুদ্ধ গাযা অধিবাসী। হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে ইসরাঈলে একাধিক রকেট নিক্ষেপ করে হামাস। তারপরই নির্বিচার শান্তি নেমে আসে গাযার গোটা জনগোষ্ঠীর উপর। নিক্ষেপ করা হয় শত শত টন ক্ষেপনাস্ত্র। শুরু হয় স্থল হামলা ও নির্বিচারে মানুষ হত্যা।

তিন ইহুদী কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার প্রতিশোধ নিতে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ৮ জুলাই ২০১৪ ইসরাঈল Operation Protective Edge নামের সাংকেতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে গাযায় নির্বিচার বিমান হামলা শুরু করে। এ হামলায় বর্বর ইসরাঈলীরা কোন কিছুই অক্ষত রাখেনি, হত্যা করে নিরীহ নারী ও শিশুদের। বিশ্ববিবেকের সকল আবেদন-নিবেদন উপক্ষো করে তারা চালিয়ে যেতে থাকে এ ন্যাক্কারজনক হামলা। এরপর ১৭ জুলাই ২০১৪ গাযা উপত্যকায় স্থল অভিযান শুরু করে ইসরাঈলী বাহিনী। ১৮ জুলাই ২০১৪ ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আনুষ্ঠানিকভাবে স্থল হামলা শুরুর কথা সংসদে ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেন, হামাসের সঙ্গে যেমন যুদ্ধবিরতী চুক্তি সম্ভব নয়, তেমনি শুধু বিমান হামলা চালিয়ে তাদের সুড়ঙ্গগুলোও দখলে নেয়া সম্ভব নয়। তাই সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অভিযান আরও বিস্তৃত করার। তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে বলেন, ফিলিস্তীনে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।

গাযার উপকূলে ভূমধ্যসাগর থেকে ইসরাঈলী নৌবাহিনী হামলা চালাচ্ছে। ১৭ জুলাই ২০১৪ গভীর রাতে গানবোটগুলো থেকে নিক্ষিপ্ত ট্রেসার বুলেটে ফিলিস্তীনের পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ড গাযা কমলা আলোতে ছেয়ে যায়। সীমান্ত অতিক্রম করে হেলিকপ্টার থেকেও গুলিবর্ষণ করা হয়। এ হামলার বিপরীতে ইসরাঈলের আশদদ ও আশকেলন শহরে রকেট নিক্ষেপ করে হামাসের যোদ্ধারা। কিন্তু ক্ষেপনাস্ত্র বিধ্বংসী ইসরায়েলের আয়রণ ড্রোণ গাযা থেকে ছোড়া রকেট ধ্বংস করছে।

ক্ষয়ক্ষতি : ইসরাঈল কর্তৃক গাযায় নৃশংস হামলায় অসংখ্য সামরিক, আধা সামারিক, নারী-শিশু মারা গেছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্থের ভৌত কাঠামো ধ্বংস হয়েছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ৬ আগস্ট পর্যন্ত গাযায় ১৮৯০ জন নিহত হয়েছে। বিবিসির এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নিহতের মধ্যে আছে ৪১৪ জন শিশু, ২১৯ জন নারী ও ১০৩০ জন পুরুষ। তার মধ্যে ৮৫ শতাংশের বেশী সাধারণ মানুষ। পক্ষান্তরে ৬৭ জন ইসরাঈল। পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে ৪৭৬০টির বেশী বিমান হামলা হয়েছে, ৩৩৫৬টি ইসরাঈলে রকেট ছোড়া হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া : গাযায় ইসরাঈলী বর্বরতায় বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় বইছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র ইসরাঈলের পাশে আছে বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বৃটেন মন্ত্রীপরিষদের জনৈক মুসলিম মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। বিভিন্ন দেশ ইসরাঈলে তাদের বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে গাযায় বেসামরিক ফিলিস্তীনীদের ওপর ইসরাঈলী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এ বিষয়ে চুপ থাকায় পশ্চিমা সরকার ও দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সমালোচনা করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'প্যালেস্টাইনে ইসরাঈল আক্রমণে যেভাবে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে-অবাক হয়ে যাই, বিশ্ব বিবেক কিভাবে চুপ করে থাকে'। তিনি আরো বলেন, 'এখানে (বাংলাদেশে) একটা মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে কত কংগ্রেসম্যানের চিঠি পাই। প্রতিবাদ পাই, কত কিছু। আর আজকে শত শত শিশু-নারী এমনকি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের গুলি করে মারা হচ্ছে। এখন তাদের বিবেক নাড়া দেয় না কেন? তিনি প্রশ্ন করে বলেন, এই যে সভ্য দুনিয়া, যারা নিজেদের সভ্য বলে মনে করে, তারা কেন এখন চুপচাপ? এ বিষয়ে দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সমালোচনা করে বলেন, আমাদের দেশে কত মানবাধিকার সংস্থা আছে, কছ কিছু। একটু কিছু ঘটলেই ছুটে আসে। কই আজ তাদের কণ্ঠ নীরব কেন?

আইকিউ

[কুইজ-১; কুইজ-২; বর্ণের খেলা-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৭ (১) :

১. ১ম বায়‘আতে কতজন ইয়াছরিব উপস্থিত ছিল?
২. ইসলামের ইতিহাসে মদীনায় প্রেরিত প্রথম দাঈর নাম কী?
৩. গাসীলুল মালায়েকা কাকে বলা হয়?
৪. কুরবানীকে হাদীছের ভাষায় কী বলা হয়?
৫. কুরবানী কোন নবীর সুন্নাত?
৬. ১ম বিশ্বযুদ্ধ কত সালে সংগঠিত হয়েছিল?
৭. ‘হত্যা সব সমস্যার সমাধান’ এটি কার মন্তব্য?
৮. ‘জিওনিষ্ট আন্দোলন’ কী?
৯. রয়টারস কী?
১০. ‘তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া’ আন্দোলনের প্রবর্তক কে?
১১. শিখ বিরোধী জিহাদ কত বছর স্থায়ী ছিল?
১২. আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) পাবনায় কত সালে বক্তব্য দেন?
১৩. আটলান্টিক মহাসাগরে জেগে উঠা চরের নাম কী?
১৪. পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরাতন জাতির নাম কী?
১৫. পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে করাচীর দূরত্ব কত?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. শাহ অলিউল্লাহ ২. ৪০০ ৩. ৬০০ গ্রাম ৪. মুছ‘আব বিন উমায়ের ৫. মাওলানা বেলায়েত আলী ৬. ৬ জন ৭. একটি ভ্রান্ত আক্বীদা ৮. কুরআন ও হাদীছ ৯. ৪৪৮ হিজরী; জেরুযালেমে বায়তুল মুকাদ্দাস ১০. ইয়াউমে বাবুল ইসলাম ১১. আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। ১২. ২৫০ হিঃ ১৩. নারায়ণগঞ্জে একসাথে ৭ জনের অপহরণ ও খুন। ১৪. আওরঙ্গযেব আলমগীর ১৫. সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

কুইজ ১/৭ (২) :

১. ইবরাহীম (আঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২. ইবরাহীম (আঃ) কোন্ জাতির নিকট প্রেরিত হন?
৩. ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে কি দাওয়াত দেন?
৪. ইবরাহীম (আঃ)-এর নিজ পরিবারে কে কে মুসলিম হন?
৫. হিজরতের সময় ইবরাহীম (আঃ) ও সারার বয়স কত ছিল?
৬. ইবরাহীম (আঃ) কোথায় শয়তানকে পাথর মারেন?
৭. ‘আবুয যায়ফান’ কার উপাধী?
৮. নমরূদ কত বছর রাজত্ব করেন?
৯. কত বছর বয়সে ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে?
১০. ইবরাহীম (আঃ)-এর জাতি সম্পর্কে কুরআনে কয়টি সূরায় কয়টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
১১. ‘ঈদুল আযহা’-এর শিক্ষা কী?
১২. ইবরাহীম (আঃ) কয়টি স্বপ্ন দেখেছিলেন?
১৩. ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তান কয়টি ও কে কে?
১৪. ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে কয়জন নবীর আবির্ভাব হয়েছে এবং কে?
১৫. ‘আবুল আম্বিয়’ কার উপাধি?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. ২য় হিজরীতে ২. ৫০ দিন ৩. একদিন বাদে একদিন ৪. ৯। ৫. তাক্বওয়া অর্জন ৬. অধিক জ্বলে-পুড়ে খাক হওয়া ৭. রামাযান মাসে ৮. আশূরার ৯. তারাবীহ ১০. বিতর সহ ১১ রাকা‘আত ১১. রামাযানের শেষ দশকে বিজোড় রাত্রিতে ১২. এক ছা; খাদ্যবস্তু ১৩. মু‘আবিয়া ১৪. না। ১৫. সত্তর থেকে সাতশ’।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান (মুচড়া, সাতক্ষীরা) ২. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-হারিছ (পাংশা, রাজবাড়ী) ৩. আব্দুল্লাহ আল-মুজাহিদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

বর্ণের খেলা ৩/৭ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে নবী-রাসূলদের মৌলিক কাজের নাম জানা যাবে।

১.....
২.....
৩.....
৪.....

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম.....

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : ১. রাযযাক ২. মাহবুব ৩. যাকারিয়া ৪. রহমান; **অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : রামাযান**

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৭:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

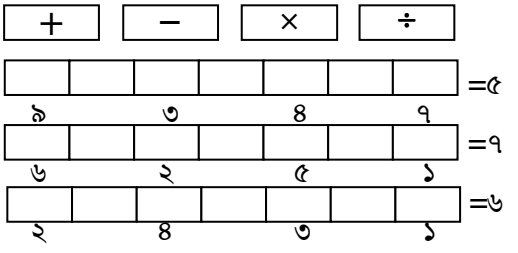

গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর : (১) ১১−২÷৩+১= ৪ (২) ৮÷২−৩+৯=১০ (৩) ২×৫−৭+৩= ৬

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান (মুচড়া, সাতক্ষীরা) ২. শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা) ৩. আব্দুল্লাহ আল-হারিছ (পাংশা, রাজবাড়ী)।

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা** : বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*